পরম ভাগবত মহাত্মা কবীর

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৭

প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্.-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

দাম—
ছয় টাকা

॥ উৎসর্গ ॥

স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক পরম শ্রদ্ধেয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে-

পরম ভাগবত মহাত্মা কবীর

॥ এক ॥

কাশীতে এসে এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে বলছে, এই যাবি দেখতে 'কবীর-চৌরা' ?

আর এক বন্ধু মনের ঔৎসুক্য প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো, সে আবার কি ?

উত্তরে বন্ধুটি বললে, মহাসাধক এবং পরম ভাগবত কবীরদাসের পবিত্র সমাধি মন্দির। তাকেই বলে 'কবীর-চৌরা'। কাশীতে এসে সেখানে একবার না গেলে কাশী আসা সার্থক হয় না। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

তখন দু'জনে চললো এগিয়ে কবীর-চৌরার দিকে। ভারতবর্ষে প্রাচীনতম ধর্ম বলতে বৈষ্ণব ধর্মকেই বোঝায়। ঋকবেদে এর উল্লেখ আছে। ভগবান শঙ্কর ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব। পিতামহ ব্রহ্মাকেও বৈষ্ণব বলতে আপত্তি থাকে না। কারণ তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করতেন।

অতি প্রাচীনকালে দ্রাবিড় দেশে প্রথমে বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান হয়। পরে তা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

দ্রাবিড় ভক্তগণ দু' প্রকারের বৈষ্ণব ছিলেন। একদল বৈষ্ণব ছিলেন—যাঁরা শাস্ত্র মেনে চলতেন। তাঁদের বলা হতো দীঘলভুরী। আর একদল ছিলেন—যাঁরা আদৌ শাস্ত্রের ধার ধারতেন না। তাঁরা প্রেম-ভক্তির সহজসরল পথ ধরে চলতেন। এঁদের বলা হত বেভূরী। দ্বিতীয় দলের ভক্তেরা আলোয়ার নামে পরিচিত ছিলেন। বিষ্ণুই ছিলেন এঁদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। আলোয়াররা নীচ-

জাতির মধ্যে উদারভাবে প্রেম-ভক্তি ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে যান। আলোয়ারদের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রসার-লাভ করে। এঁরা সংস্কার, আচার এবং শাস্ত্রের বড় একটা ধার ধারতেন না। সহজিয়া সাধনভজনে ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান।

একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ (একাদশ), আনন্দতীর্থ (দ্বাদশ), নিম্বার্ক (দ্বাদশ) এই ক' জন প্রধান বৈষ্ণবাচার্যের আবির্ভাব হয়।

এঁরা এক নতুন মতের প্রচার করেন। তবে এঁদের মতের ওপরও আলোয়ারদের সহজ প্রেমমার্গীয় ধর্মমতের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এঁরা শাস্ত্রকে অস্বীকার করেন নি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের সঙ্গে আপোস করে চললেন। এঁদের ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল প্রেম ও ভক্তি। সে প্রেম বৈধী আবার হবে একান্তভাবে রামানুগা! এই দুই ভাবের সমন্বয় করে চলবে। আচার্য রামানুজ প্রেমভক্তির প্রভাবে নীচ জাতিদের মধ্যে কাজ করে চললেন। তিনি বিতরণ করলেন প্রেম। তার ফলে সমাজে যারা এতদিন ধরে অবহেলিত হয়ে আসছিল, যারা নীচ বলে পরিচিত হতো, তারা তাঁর প্রেমমন্ত্র বলে আবার উন্নত হয়ে উঠলো। তবে তাদের আলাদা পংক্তিভোজনের ব্যবস্থা হলো। ব্রাহ্মণের সঙ্গে একত্রে আহার করতে পারবে না। আচার্য রামানুজ বর্ণাশ্রম ধর্ম মেনে নিয়ে তবে সকলের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমভাব বিতরণ করেছেন। তিনি বেশ বুঝতেন যে, আমরা উচ্চ-নীচ সকল জাতির মানুষই ঈশ্বরের সন্তান—অমৃতের পুত্র। তবে লৌকিক মতে প্রত্যেক লোক নিজের সামাজিক অধিকারবলে বিষ্ণুর উপাসনায় রত থাকবে। ব্রাহ্মণেরা করবে বিধিবদ্ধ আরাধনা আর অব্রাহ্মণরা করবে বিধিবহির্ভূত—প্রেমের সহজসরল পথে উপাসনা। এভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মে থেকেও তিনি তাঁর উদার ধর্মমত উচ্চনীচ সকল স্তরের মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন।

রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরু রাঘবানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নেন রামানন্দ। তিনি রামানুজ থেকে পঞ্চম শিষ্য। ১৪০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গুরু রামানন্দের সময়।

গুরু রামানন্দের মধ্যে কোনরকম সংকীর্ণ ভাব ছিল না। তিনি নীচ জাতির একাধিক লোককে দীক্ষা দিয়েছেন। কবীর জোলা, রবিদাস মুচি, ধনা জাঠ ও সেনা নাপিত ছিলেন তাঁর শিষ্য।

মূর্তিপুজোর প্রতি রামানন্দের বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি ভাবতেন, তাঁর ইষ্টদেব কেবল মানুষের তৈরী ইটের দেওয়ালঘেরা মন্দিরে নেই, তিনি আছেন সমগ্র বিশ্বমন্দিরে।

গুরু রামানন্দ স্বীকার করতেন, জীবে ব্রহ্মে ভেদ এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব।

ভক্তির মাহাত্ম্য এবং তার গুরুত্ব প্রচার করে যান গুরু রামানন্দ। তাঁর শিক্ষা, তাঁর সাধনার প্রধান কথা হলো ভক্তি। ভগবানকে লাভ করার প্রধান উপায় হচ্ছে ভক্তি। অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগতি, অহেতুক প্রেম, বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ এইগুলিই হচ্ছে ভক্তির লক্ষণ। ভগবৎ সাধনার মূলে রয়েছে ভক্তির আধিক্য। এইটিই হচ্ছে আচার্য রামানন্দের দান।

সেইজন্যে প্রবাদ আছে—

'ভক্তী দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ,
প্রগট কিয়া কবীর নে সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড।'

অর্থাৎ—ভক্তি প্রথমে উৎপত্তি হলো দ্রাবিড়ে। রামানন্দ তাকে নিয়ে এলেন আর কবীর তাকে সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রচার করলেন।

আসল কথা, দ্রাবিড় দেশ থেকে রামানন্দ ভক্তিকে নিয়ে এলেন উত্তর ভারতে। তাঁর প্রধান শিষ্য কবীর সেই পরম ধর্ম প্রচার করলেন সমগ্র উত্তর ভারতে।

আচার্য রামানুজের উপাস্য দেবতা ছিলেন নারায়ণ, বিষ্ণু ও

শ্রী। পরবর্তী কালে তাঁর উপাস্য দেবতা হলেন রামচন্দ্র। কারণ, রামচন্দ্র হচ্ছেন বিষ্ণুর অন্যতম অবতার। পরবর্তী জীবনে রামানন্দের মুখে রাতদিন রামনাম উচ্চারিত হতো। তিনি শিষ্যদের ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষা দিতেন।

উত্তর ভারতে রামনাম প্রচার করতে কাশীতে এসেছেন রামানন্দ। এই কাশী হচ্ছে মর্তের স্বর্গ। হাজার হাজার বছর ধরে এখানে বহু সহস্র মুনি ঋষি এবং সিদ্ধ সাধকদের পবিত্র পদধূলি পড়েছে। এখানে স্বয়ং কাশীশ্বর দেবাদিদেব শঙ্কর নিত্য বিরাজ করছেন। তিনি মৃত্যুপথযাত্রী জীবদের কানে কানে তারকব্রহ্ম নাম শুনিয়ে তাদের উর্ধ্বলোকে যাবার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন। এখানে দেহরক্ষা করলে তার যাত্রা হয় পরম লোকে। যে ব্যক্তি সাধুচিত্তে তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে সজ্ঞানে দিব্যদেহ লাভ করে স্বর্গে চলে যায়। তার আর পুনর্জন্ম হয় না। সে হয় নিত্যধামবাসী। আনন্দসহচর।

এমনি পবিত্র তীর্থ ভূস্বর্গ কাশীতে এসেছেন রামানন্দ। শিবের অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীতে কয়েকদিন অবস্থান করছেন। নিত্য পবিত্রসলিলা পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর কোলে অবগাহন করেন আর শ্রদ্ধাভরে রামনাম কীর্তন করেন। যারা তাঁকে দেখতে আসে তারা ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়ে। দূর হতে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে চলে যায়। কেউ কেউ ওখানে বসে পড়ে। তন্ময় চিত্তে নামগান শোনে।

রামনাম-প্রেমিকদের দেখলে আনন্দিত মনে গান করতে থাকেন আচার্য রামানন্দ।

একদিন সকালে রামানন্দ গঙ্গার তীরে বসে রামনাম কীর্তন করছেন মধুর স্বরে। এমন সময় তাঁর জনৈক ব্রাহ্মণশিষ্য এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি আচার্যকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে বসলেন তাঁর সামনে।

শিষ্যের সঙ্গে এসেছে তাঁর বালবিধবা কন্যা। সেও পিতার দেখাদেখি ভক্তিপ্রণাম নিবেদন করলো গুরু রামানন্দকে।

রামানন্দ তার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন, অচিরে পুত্রবতী হও মা।

গুরুর আশীর্বাণী শুনে আঁৎকে উঠলেন ব্রাহ্মণশিষ্য। ভাবলেন, একী কথা বললেন গুরুদেব! আমার কন্যা যে বালবিধবা!

কন্যার অন্তরেও বইতে লাগলো কালবৈশাখীর ঝড়। সে মাথা নত করে সভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আচার্যদেবের সামনে। তার মুখমণ্ডল ক্ষণিকের জন্যে বিবর্ণ হয়ে গেল। লজ্জার রক্তিমাভা ফুটে উঠলো চোখেমুখে।

তার পিতার মুখমণ্ডলও বিষণ্ণ। অন্তর্যামী গুরুদেব তীব্র অনুভূতি দ্বারা বুঝতে পারলেন শিষ্যের মর্মব্যথা।

একবার শিষ্যের মুখপানে তাকিয়ে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, নীরব হলে কেন? কৈ জিজ্ঞেস করো আমাকে তোমাদের বক্তব্য। তাছাড়া তোমার মুখমণ্ডল অমন বিষণ্ণ বোধ হচ্চে কেন?

ব্রাহ্মণশিষ্য করজোড়ে বললেন, বাবা, আমার কন্যা যে বাল-বিধবা। ওর যদি এখন কোন পুত্রসন্তান হয়, তাহলে ও হবে কলঙ্কিনী। সমাজ ওকে পতিতা বলে দূরে সরিয়ে রাখবে।

আমার কথা কখনো অসত্য হবে না, গম্ভীর স্বরে বললেন আচার্যদেব।

একটু থেমে পুনরায় বললেন, আমি যা বলেছি তার একবিন্দুও মিথ্যে নয়। তবে তুমি যার জন্যে আশঙ্কা করছো সে ভয় নেই। আমি তার যথারীতি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

গুরুর ঐ কথা শুনে এবার যেন স্বস্তি বোধ করলেন ব্রাহ্মণশিষ্য। করজোড়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কন্যাও অধীর আগ্রহ নিয়ে উৎসুক হয়ে উঠলো গুরুদেবের পরবর্তী ভাষণ শোনার জন্য।

গুরুদেব বললেন মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে, বৎস! মনের কোণে

কিছুমাত্র দুর্বলতা রেখো না। দৈববিধান মেনে চলো। তাহলে দেখবে, কোনরকম ভয়ভাবনা থাকবে না।

ভক্তের মনে প্রশ্ন জাগলো, কী সেই দৈববিধান! ভাবলেন, মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করবেন গুরুদেবকে।

অন্তর্যামী গুরু আগে থেকেই বুঝতে পারলেন শিষ্যের অন্তরকামনা। গুরুই যে অন্তর্যামী ঈশ্বরের এক অংশ। সেই করুণাময় ঈশ্বর কখনো স্বয়ং গুরু-রূপে এসে ভক্তকে কৃপা করেন, কখনো বা আংশিকরূপে প্রকাশিত হন।

সেই গুরুর কথা কী ব্যর্থ হয়! তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান। গুরুগতপ্রাণ ব্রাহ্মণ চিত্রার্পিতের মত তাকিয়ে রইলেন রামানন্দের মুখপানে।

এবার রামানন্দ আরম্ভ করলেন বলতে। বললেন, তোমার কন্যা কোন পুরুষের সাহায্যে গর্ভবতী হবে না। দৈববিধানে এক মহাপুরুষ বায়বীয় শরীরে এসে ওর গর্ভে জন্ম নেবেন। কালে ও একটি সুন্দর অবয়বযুক্ত শিশু প্রসব করবে।

গুরুর কথা শুনে মনে কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন ব্রাহ্মণসন্তান। তথাপি মনের কোণে শান্তি ছিল না তাঁর। অহরহ সেই একই চিন্তা হতে থাকে, লোক বা সমাজ কী বলবে তাঁকে! তিনি কী ভাবে মুখ দেখাবেন সকলের সামনে!

অথচ গুরুবাক্য লঙ্ঘন হবার উপায় নেই। তাকে এড়াবারও ক্ষমতা নেই শিষ্যের। একান্ত নির্ভয়-চিত্তে গুরুর ওপর নির্ভর করে রইলেন ব্রাহ্মণ। গুরুই একমাত্র শরণাগতি। তিনিই শিষ্যের জীবনাকাশে ধ্রুবতারা, পরিবারের সুখশান্তির নিয়ামক।

সেদিন আর কোন কথা বা উপদেশ না শুনে শান্ত মনে গুরু-চরণে ভক্তিপ্রণাম নিবেদন করে বাড়ি ফিরলেন ব্রাহ্মণশিষ্য এবং তাঁর বালবিধবা কন্যা।

॥ দুই ॥

প্রতিদিন গুরুর প্রতিমূর্তিকে পূজো করে ব্রাহ্মণকন্যা। ভক্তিভরে জানায় অন্তরের প্রার্থনা, গুরুদেব, আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন। আমার এবং আমার বাবার মান বাঁচান।

এমনিভাবে দিনের পর দিন প্রার্থনা চলতে থাকে।

একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলো ব্রাহ্মণকন্যা, একটি জ্যোতির্ময় দেহধারী শিশু হাসতে হাসতে তার সামনে এসে তার শরীরে মিলিয়ে গেল।

স্বপ্ন দেখামাত্র ঘুম ভেঙ্গে গেল ব্রাহ্মণকন্যার। শেষ রাতটুকু আর ঘুমুতে পারলো না। মন আনন্দ ও ভয়ে বিচলিত হয়ে উঠলো। তখুনি মনে পড়ে গেল গুরুদেবের ভবিষ্যৎ বাণী।

ক্রমে রাত শেষ হলো। ভোর না হতেই পবিত্র জাহ্নবী সলিলে অবগাহন করে এলো ব্রাহ্মণতনয়া। মনে মনে প্রণাম নিবেদন করলো গুরুদেবকে এবং তাঁর ইষ্টদেব রামচন্দ্রকে—যিনি দুর্বলের পরম বন্ধু, অসহায়ের একমাত্র সহায়।

পিতার কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত গোপন করে রাখলো ব্রাহ্মণতনয়া। ক্রমে নির্দিষ্ট সময়ে সে একটি নধর কান্তিযুক্ত শিশু প্রসব করলো।

শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র পিতা ও কন্যার মনে জাগলো যুগপৎ চিন্তা। পিতা ভাবলেন, এবার বোধহয় তিনি সমাজচ্যুত হবেন। অথচ নবজাত শিশুকে হত্যা করাও উচিত নয়। একে শিশু, তার ওপর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণহত্যা যে মহাপাপ। দু'জনে তখন আচার্যদেবের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। গুরুর আদেশের তুলনায় লোকভয় জাগ্রত হয়ে উঠলো পিতা এবং কন্যার মনে। নবজাত শিশুই হয়ে দাঁড়াল এক বিরাট সমস্যা।

অবশেষে কন্যার মনে জাগলো এক বুদ্ধি। সে ঠিক করলো, সে যেখানে থাকে তার থেকে কিছু দূরে রয়েছে একটি পুকুর। পুকুরে ফুটে আছে বহু পদ্ম। তার মাঝখানে ভাসিয়ে দেবে শিশু-পুত্রকে। তাহলে লোকলজ্জা বা সমাজভয় তাদের স্পর্শ করবে না। আর কেউ অপবাদ দেবে না বালবিধবার গর্ভে সন্তান জন্মেছে বলে।

তাই গুরুদেবের কথা বিস্মৃত হয়ে, পাপপুণ্যের বিচার না করে, সম্পূর্ণ লোকভয়ে ভীতা ব্রাহ্মণতনয়া নবজাত সন্তানকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি চলে এলো পদ্মপুকুরের ধারে। কলা-গাছ দিয়ে তৈরি একটা ছোট্ট ভেলার ওপর শিশুটিকে শুইয়ে ভাসিয়ে দিলো জলে।

পুকুরের ধারেই রয়েছে একটি দেবমন্দির। সেখানে ভক্তি-প্রণাম নিবেদন করে বললে, ঠাকুর, আমার পাপ ক্ষমা করো। আমি শিশুটিকে রক্ষা করতে পারলুম না, তুমি একে রক্ষা করো।

প্রণাম সেরে বিধবা চলে এলো গুটি গুটি পায়ে পিত্রালয়ে। রাত্রিবেলায় এসব ক্রিয়াকর্ম হয়েছে বলে বাইরের কেউ জানতে পারলো না। নির্ভয়ে ঘরে অবস্থান করতে লাগলেন ব্রাহ্মণশিষ্য এবং তাঁর তনয়া।

॥ তিন ॥

যার কেউ নেই তাকে দেখেন ঈশ্বর। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে দয়ার কোন অভাব হয় না। তাঁর কৃপা জীবের জীবনে সর্বদা এসে লাগছে। জীব মোহান্ধ—সে ইন্দ্রিয়ের দাস। সংসারের নশ্বর সুখদুঃখে লিপ্ত আছে বলে নিজেকে ঠিকমত জানে না।

তাই আত্মজ্ঞান না হলে পরমার্থ জ্ঞান বা সে বিষয়ে চিন্তা আসবে কী ভাবে! অথচ তিনি আমাদের পাশে পাশে নিত্য অবস্থান করছেন। আমাদের ডাকছেন তাঁর দিকে। তিনি যে কৃষ্ণ। আমাদের সর্বদা আকর্ষণ করছেন তাঁর দিকে। তিনি দিচ্ছেন দুঃখ। এই দুঃখই ত জীবের জীবনে সুখের দ্যোতনা। দুঃখের চাপে পড়ে জীব স্মরণ করবে ঈশ্বরকে। তখন দয়াময় ঈশ্বর এসে তাঁকে কৃপা করবেন—তাঁর প্রেমধন প্রদান করে ভক্তের জীবন সরস ও সুখময় করে তুলবেন। তিনি যে লীলাময়। জীবকে বাদ দিয়ে—তাকে ভুলে তিনি থাকতে পারেন না। তাকে তাঁর চাই-ই। তাকে নিয়েই তাঁর লীলার প্রসার এবং পরিণতি। সাধারণ জীব এই সত্য ঠিক ঠিক জানতে বা বুঝতে পারে না। তাই দুঃখের মাঝে হাত-পা ছেড়ে কাঁদতে বসে। অথচ সেই সময় একবার যদি তাঁর ওপর সর্বস্ব পণ করে নির্ভর করা যায়, তাহলে তিনি দয়াময় মূর্তিতে প্রকাশ হন জীবের দুঃখ দূর করতে। যেমন বহুবার ভক্তের আহ্বানে—তার আকুল ক্রন্দন শুনে ভগবান এসেছিলেন তার কাছে—কৃপা করেছিলেন। এমন নজির আছে আমাদের প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রে এবং আধুনিক কালেও।

জীবের মধ্যে মানব হচ্ছে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই মানবের দুঃখ দেখলে তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়।

নিষ্পাপ সদ্যজাত শিশু অসহায় অবস্থায় পদ্মবনে শুয়ে আছে। রাত শেষ হয়ে সকাল হয়েছে। শরতের সুনির্মল নীলাকাশে দেখা দিয়েছে উদয় রবির অনাবিল সোনালী হাসি। সেই হাসির ছটায় শিশুর মুখও হেসে উঠলো ক্ষণিকের তরে। তারপর পদ্মবনের মধ্যে থেকে একটি পতঙ্গ এসে কামড়াল শিশুর শরীরে। সে আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো। তার কান্না আর থামে না। এক নাগাড়ে কাঁদতে লাগলো।

পদ্মবনের কাছেই ছিল একটি মুসলমান স্ত্রীলোক। সে জোলার

ঘরের স্ত্রী। এসেছে এখানে পদ্ম সংগ্রহ করতে। মাইল খানেক দূরে তার বাড়ি। নাম তার নীমা। স্বামীর নান নীরু। গরীব মুসলমান পরিবার। তাঁত বুনে কোন রকমে জীবনধারণ করে। আর মাঝে মাঝে পদ্ম ফোটার সময় হলে এখানে এসে পদ্ম সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতো। কাশীর বাজারে পদ্মফুলের খুব দাম ও মান। সেখানে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। অনেক ভক্ত বাবা বিশ্বনাথ এবং মা অন্নপূর্ণার পূজো করে ঐ পদ্মফুল দিয়ে। তাই নীমা মাঝে মাঝে আসে পদ্মপুকুরে কিছু ফুল আহরণের আশায়। সংসারে কিছু সাশ্রয় হবে এমন ভাবে বাড়তি রোজগার দিয়ে।

কান্না শোনার পর থেকে নীমার মনটা যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লো। সে যে-কাজে এসেছিল তা আর সমাপ্ত হলো না।

দু'চারটি পদ্ম শাড়ির কোঁচরে পুরে নিয়ে এলো সেখানে যেখান থেকে ভেসে আসছিল নবজাত শিশুর করুণ কান্না।

নীমা দেখলো, একটি সদ্যজাত শিশু একটানা কাঁদছে। তাঁর সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ হয়ে গেছে সূর্যতাপে। শিশুর প্রতি মায়া জন্মালো নীমার। সে নিঃসন্তান। তাই মাতৃপ্রেম তার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হলো। সে স্থির থাকতে পারলো না। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো শিশুর ছোট্ট শরীর। তারপর তাকে সাবধানে বুকের মাঝে তুলে নিয়ে বললে, আহা রে, কে এমন পাষণ্ড আছে! এমন সুন্দর একটি শিশুকে এখানে শুইয়ে রেখে গেছে!

শিশুর দু'গালে বারংবার চুমু খেতে লাগলো নীমা। তারপর তাকে যত্ন করে বুকের মাঝে রাখলো। পরে একমনে ঘরে ফিরে এলো।

তার স্বামী নীরু তখন ঘরে ছিল না। হাটে গেছিল। কিছুক্ষণ পরে সওদা করে ফিরলো।

বাড়ির দাওয়াতে একটি সুন্দর শিশুকে দেখে প্রশ্ন করলো নীরু তার স্ত্রী নীমাকে, এই শিশুটি কোথা থেকে এলো ?

নীমা স্বামীর কথায় প্রথমে জবাব দিলো না। নিছক কৌতুক দেখবার জন্যে মুচকি হেসে তাকিয়ে রইলো স্বামীর মুখের দিকে।

স্বামী পুনরার জিজ্ঞেস করলো, বলো না, একে কে দিয়ে গেল ? না, তুমি কার বাড়ি থেকে নিয়ে এলে ?

এবারও নীমা নিরুত্তর।

উত্তর না পেয়ে নীরু ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় নীমা স্বামীকে আহ্বান জানিয়ে বললে, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবো। তুমি রাগ করবে না, বলো ?

নীরু বললে, বলো না তোমার কথা। রাগ করবো কেন ?

স্বামীর কাছ থেকে বাক্‌স্বাধীনতা লাভ করবার পর মনের মধ্যে দ্বিগুণ সাহস বেড়ে গেল নীমার। সে সোহাগ ও আনন্দ-মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে বললে, আমি এই ছেলেটিকে ঘরে রেখে মানুষ করতে চাই। আমাদের ত ছেলে নেই।

স্ত্রীর কথা বড় অদ্ভুত বোধ হলো নীরুর কাছে। সে ভাবলো, নীমা বলছে কী! তার মাথা খারাপ হয় নি ত! কার ছেলেকে নিয়ে এসেছে বাড়িতে! এখুনি হয়তো নবাবের লোক আসবে! ধরে নিয়ে যাবে তাকে কাজির কাছে!

এই সব নানারকম ভয়মিশ্রিত ভাবনায় উতলা হয়ে উঠলো নীরুর অন্তর। মনে জাগলো বিভিন্ন প্রশ্ন।

স্ত্রীর কথা শুনে কিছুক্ষণ ভাবলো নীরু। তারপর প্রশ্ন করলো, এ ছেলেটি কার ? কোথা থেকে নিয়ে এলে ?

নীমা বললে, কার ছেলে বলতে পারি না, তবে আমি একে কুড়িয়ে পেয়েছি পদ্মবন থেকে। আজ ভোরবেলায় যখন পদ্ম-পুকুরে যাই পদ্মসংগ্রহের জন্যে, তখন গিয়ে দেখি এক আশ্চর্য ব্যাপার! এতদিন ধরে ওখানে যাচ্ছি-আসছি, একবারও এ

রকম দৃশ্য চোখে পড়েনি। আজ কেন হঠাৎ এমন হলো ? আমাদের ঘরে ত কোন ছেলে নেই। আমরা একে মানুষ করবো !

নীরু বললে, যদি কেউ এর জন্যে আমাদের দোষ দেয় ?

নীমা বললে, তার জন্যে আমি ঘাবড়াই না। আমরা আল্লার কাছে ত কোন দোষ করি নি।

নীরু আর কোন কথা বললো না। নীরবে মেনে নিলো স্ত্রীর প্রস্তাব।

এখন থেকে শিশুটি তাদের কাছেই রইলো।

॥ চার ॥

জোলা নীরু আর নীমার ঘরে মানুষ হতে লাগলো ব্রাহ্মণ বিধবার সন্তানটি। রামানন্দ-শিষ্যটি কাশী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন। তাঁর কন্যাও গেল পিতার সঙ্গে। না গিয়ে কী উপায় আছে! লোকলজ্জা বলে ত একটা কথা আছে!

রামানন্দ বিস্মৃত হয়েছেন শিষ্যকে। তিনিও ভারতের অন্যান্য জায়গা পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। রম্‌তা সাধু। সাধু কখনো একজায়গায় অবস্থান করেন না। তাহলে মায়া এসে তাঁকে বশ করবে। মায়ার স্বর্ণশৃঙ্খলে একবার আবদ্ধ হলে আর তার নাগাল থেকে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর। তখন ঋষির ঋষিত্ব যাবে ঘুচে।

সাধুদের নিয়ম রক্ষা করছেন রামানন্দ। ওদিকে লোকলজ্জার ভয়ে রামানন্দের ব্রাহ্মণ-শিষ্য এবং তাঁর কন্যা কাশী ত্যাগ করে অন্যত্র সরে পড়েছেন। মুসলমান জোলা পরিবার নীরু ও নীমার ঘরে লালিত-পালিত হচ্ছে নবজাত শিশুটি। নীরু ও নীমার মনে

এই ধারণা জন্মাল যে, তাদের কোন সন্তান না হলেই বা, দয়াময় ঈশ্বর অন্য উপায়ে তাদের সে অভাব দূর করেছেন। সেই কারণে শিশুটির প্রতি রাতদিন সজাগ দৃষ্টি রাখতে লাগলো।

একদিন নীমা ও নীরু দু'জনে স্বপ্ন দেখলো, শিশুটি জ্যোতির্ময় রূপ ধরে তাদের সামনে এসে যেন বলছে, পূর্বজন্মে তোমরা আমার বিশেষ সেবা করেছিলে। তাই এবার আমি তোমাদের ঘরে ছেলে হয়ে এসেছি। আমি এবার তোমাদের মোক্ষলাভের ব্যবস্থা করে দেবো।

ঐ রকম স্বপ্ন দেখার পর থেকে নীমা ও নীরুর পালিত পুত্রের প্রতি স্নেহ দিন দিন বেড়ে যেতে লাগলো।

ক্রমে ছেলেটি বড় হতে লাগলো। সময় এলো তার নামকরণের।

এখন নাম কে নির্বাচন করবে? এ ব্যাপারে একমাত্র কাজিরই শক্তি আছে। ডাক পড়লো কাজির। নীরু একদিন কাজির বাড়িতে এসে বললে, সেলাম কাজিসাহেব। আপনাকে একবার আমার বাড়িতে পদধূলি দিতে হবে।

কাজি বললে, কেন বলো ত?

নীরু বললে, সে কথা পরে বলবো। আগে চলুন ত আমার বাড়িতে।

কাজি বললে, না, আগে আমাকে যাওয়ার কারণ বলতে হবে। তারপর আমি যদি যাওয়া ভাল বিবেচনা করি তবে যাব, না হলে যাব না।

নীরু তখন আরম্ভ করলো বলতে। আদ্যপান্ত সমস্ত কাহিনী নিবেদন করলো। তার স্ত্রী গেছিল পদ্মপুকুরে পদ্ম সংগ্রহ করতে। কিন্তু পদ্ম আর সংগ্রহ করতে পারলো না সেদিন। তার বদলে আর এক পদ্ম সংগ্রহ করে আনলো—যার মূল্য কেউ সহজে ধারণা করতে পারে না। এই অমূল্য রত্নকে ফেলে কে আর যায় সামান্য বনের পদ্ম সংগ্রহ করতে।

সব শুনে কাজি বললে, বেশ একটা শুভদিন দেখে আমি যাব তোমার বাড়িতে। তুমি তৈরি থেক। যাবার আগে আমি তোমাকে খবর দেবো।

নীরু সম্মত হলো কাজির কথায়। আপন মনে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরলো। স্ত্রীকে দেখে আনন্দের বার্তা নিবেদন করলো, ওগো, আজ আমার অন্তরটা আনন্দে ভরে উঠেছে। কাজিসাহেব রাজী হয়েছেন আমাদের বাড়িতে আসতে।

নীমা চোখদুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে বলে, কেন, কি কারণে আসবে কাজিসাহেব আমাদের বাড়িতে?

নীরু বললে, কেন, আমাদের ছেলের যে নামকরণ করতে হবে!

নীমার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মাতৃত্বের দ্যুতি মুখমণ্ডল ভরে প্রকাশিত হলো। তার কমনীয়তা নীরুর অন্তরকে স্পর্শ করলো। কিছুক্ষণ দু'জনে নীরবে সুখের অনির্বচনীয় অনুভূতি উপভোগ করতে লাগলো।

পরে নীমা বললে, আমি শুনে সুখী হলুম। কাজিসাহেব এলে তাঁর যত্নের কোন ত্রুটি হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে কাজি এলো নীরুর ঘরে।

নীরু তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালো। কাজি কোরান খুলে নাম নির্বাচন করতে বসে গেল।

কোরানের পাতাগুলি একের পর এক ওলটাতে লাগলো কাজি। যে পাতা বেরোয় তাতে এই ক'টি নাম পাওয়া গেল, কবীর, আকবর, কিবরা ও কিবরিয়া। সব কটিরই মানে এক। একই মূল তাদের, যার অর্থ মহৎ। শব্দগুলি খোদার বিষয়ে প্রযোজ্য।

কাজি ত অবাক। বই বন্ধ করে আবার খুললো। এবারও সেই নাম ক'টাই বেরুলো।

বিস্ময়ের অন্ত রইলো না কাজির। সে বারংবার চেষ্টা করতে লাগলো। কোরানের পাতাগুলি পুনঃপুনঃ ওলটাতে থাকে যদি কোন নতুন নাম চোখে পড়ে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। প্রতিবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগলো। সেই ক'টি নাম ছাড়া আর কিছুই পেল না।

ভয় পেয়ে কাজি তখন চলে গেল। এই অদ্ভুত খবর চারদিকে রটে গেল। শুনে অন্যান্য কাজিরা এলো নীরুর বাড়িতে।

তাঁরা প্রত্যেকে কোরান খুলে নাম বাছতে লাগলো। কিন্তু তাঁদের দশা সেই আগের কাজির মতই হলো। যতবার নামের সন্ধান-কার্য চালাতে যাবে ততবারই ঐ চারটি নাম তাদের নজরে পড়লো।

ঐ রকম আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখে চমৎকৃত হলো কাজিরা। ভাবলে, এত অদ্ভুত ছেলে! এ কী এমন ভাগ্য করে জন্মেছে, যাতে করে এ করবে খোদার ওপর খোদকারি! খোদা এক এবং তিনি অনাদি। তাঁর জায়গায় অন্য কেউ এসে আসন নেবে এ অসহ্য—এ হতেই পারে না। তাহলে কোরানের বৈশিষ্ট্য রইলো কোথায়!

এই সব ভেবে কাজিরা নীরুকে একটি পরামর্শ দিলো। বললে, এ অতি অলক্ষুণে ছেলে। একে মেরে ফেল। নৈলে তোমার ভীষণ বিপদ হবে।

কাজিদের মতামত অভ্রান্ত বোধ হলো নীরুর কাছে। সে ত মূর্খ। তার নিজের বোধশক্তি কিছু ছিল না। সে ছিল গোঁড়া মুসলমান। নবজাত শিশুটি বেঁচে থাকলে খোদার ওপর খোদকারি করবে। সুতরাং ও বেঁচে থেকে কী লাভ! তাহলে ত মুসলমান সমাজের সমস্ত আইনকানন যাবে বদলে। তা কখনই হতে পারে না। সুতরাং কাজিদের কথাই ঠিক। মুসলমান ধর্মকে বাঁচাতে হলে ঐ পুত্রকে হত্যা করা বিধেয়।

কাজিদের কথামত নীরু পালিত পুত্রের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তাতে করে শিশুর কিছু হলো না। এক ফোঁটা রক্ত পর্যন্ত বেরুলো না।

এই অসম্ভব কাণ্ড দেখে নীরু রীতিমত আতঙ্কিত হলো।

তাকে সশঙ্কিত অবস্থায় দেখে সেই শিশুটি একটি দোঁহা বললে। তার অর্থ হচ্ছে, আমার দেহ সাধারণ রক্ত-মাংসে গড়া নয়, এ হচ্ছে এক বিশুদ্ধ আলো।

শিশুর মুখে ওরকম দোঁহা শুনে নীরু ও কাজিরা অবাক হয়ে গেল। ভাবলো, এ নিশ্চয়ই আল্লার কোন শুভ নির্দেশ হবে। নচেৎ এতটুকু ছেলের মুখ হতে এমন সুন্দর বাণী আসবে কী ভাবে! তারা সকলে শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলো। তার নাম রাখা হলো কবীর।

নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। কাজিরা আনন্দিত মনে ফিরে গেল। যাবার সময় নীরুকে বলে গেল,—ওহে, ও ছেলেটি বড় সহজ নয়। ওর ওপর একটু সুনজর রেখ। ওর লক্ষণ-গুলি খুব ভাল মনে হচ্ছে। কালে ও একজন মহাপুরুষ হতে পারে।

কাজিদের কথা ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিলো নীরু। যে লোক একবার কাজিদের রূঢ় মতামতের ওপর নির্ভর করে নির্দোষ এবং নিষ্পাপ শিশুর বুকে ছুরি চালাতে পর্যন্ত পেছ-পা হয় নি, এখন সেই লোক কাজিদের কথা শুনে অমৃতবৎ সুন্দর হয়ে গেল। এ কোন্ দৈব ঘটনার ফলে? ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝে ক'জন।

॥ পাঁচ ॥

জোলারা মুসলমান। কিন্তু বহু আগে ওরা ছিল হিন্দুদের একটি অংশ। উত্তর ভারতের কয়েকটি স্থানে ওদের আস্তানা ছিল।

ওরা তাঁত বুনে জীবিকা নির্বাহ করতো। মুসলমান হবার আগে ওরা ছিল যোগী। ওদের ধর্ম ছিল নাথ-ধর্ম। ওদের সম্প্রদায়ের নামও নাথ। নাথ সিদ্ধান্তের চরম উদ্দেশ্য ছিল কায়া-সাধনের মারফৎ জীবন্মুক্তি লাভ। কায়াসাধনই এই ধর্মের আসল কথা। আর সেইরকম কাজ করতে হলে চাই হঠযোগের প্রয়োজন। এই কারণে নাথপন্থীরা হঠযোগের সাধনা করতেন। আর সেই জন্যেই তাঁদের বলা হত যোগী। তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গে নাথপন্থী যোগীদের কতক বিষয়ের মিল থাকলেও নাথপন্থী যোগীরা হিন্দুদের থেকে আলাদা ছিলেন। তাঁরা বেদ, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র স্বীকার করতেন না। বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং স্পর্শাস্পর্শ বিচার ছিল না তাঁদের। তাঁরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করতেন। নাথ-সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ পরে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে যায় আর একটা অংশ মিশে মুসলমানধর্মের সঙ্গে। মুসলমান হবার পরও তাঁদের মধ্যে হিন্দুদের আচার ব্যবহার বর্তমান ছিল। এমন কী তাঁরা হিন্দুধর্মের কিছু কিছু অনুষ্ঠানও করতো ভিন্নধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও। ওরা ছিল গরীব মুসলমান। তাঁতবোনা ছিল ওদের জাতীয় পেশা। কবীর এদের ঘরেই মানুষ হয়েছিলেন। তিনিও তাঁত বুনতেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুজিরোজগার প্রয়োজন। পেট তো শুনবে না কোন কথা। তাকে চালাতে হবে। কবীরের মন ভরে থাকতো আধ্যাত্মিক ভাবে। তাঁকে তাঁত বুনতে বলা হতো। কখনো বুনতেন, কখনো বা বুনতেন না। ভাবভোলা মনে চুপ করে

বসে থাকতেন। কী যেন অনুসন্ধান করে বেড়াতেন তাঁর চারপাশে। মা নীমা অনেকসময় তাঁর ব্যবহার দেখে সমালোচনা করতো। বলতো, আমরা গরীব। আমরা লেখাপড়া জানি না। তাঁত বুনতে জানি। তাঁত বুনে আমাদের পেট চলে। সেই কাজ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পেট চলবে কেমন করে! না খেয়ে মরতে হবে।

কবীর মার কথামতো মাঝে মাঝে জাত-ব্যবসায় মন দিতেন। মাকে বলতেন, বেশী রোজগার করে কী হবে! পেট চালাবার মত রোজগার হলেই যথেষ্ট। হাতে বেশী টাকা থাকলে ঈশ্বরের দিকে মন যাবে না। তবে তিনি এটুকু বিশ্বাস করতেন যে, জীবিকা অর্জনের জন্যে শ্রম করা প্রয়োজন। তাই প্রায়ই বলতেন,—

'কহৈ কবীর অস উত্তম কীজৈ,
আপ জীয়ৈ ঔরনকো দীজৈ॥'

অর্থাৎ—কবীর বলছেন, এমনি উত্তম করবে যাতে করে নিজের জীবিকা চলে আর অন্যকেও কিছু দিতে পার।

কাপড় বোনা শেষ হলে হাটে আনতেন সেগুলি বিক্রি করতে। বিক্রি হয়ে গেলে যে কটি পয়সা পেতেন, তাই দিয়ে খাবার কিনে গরীব দুঃখীদের দিতেন।

মা নীমা তার জন্যে কবীরকে নানা রকম রূঢ় কথা শোনাতো। কবীর হেসে উড়িয়ে দিতেন। সে সব কথা কানে নিতেন না।

লেখাপড়া শেখবার সুযোগ হয়নি কবীরের। কারণ, অতি গরীব পরিবারে থেকে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না। কাশীর পণ্ডিত সমাজে তখন মাঝে মাঝে বিরাট সভার আয়োজন হতো। সেই সভায় এক পাশে বসে কবীর তাঁদের কথাবার্তা শুনতেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে-সব কথা হতো সেগুলি শুনতেন প্রাণভরে। বৈষয়িক কথাবার্তায় তাঁর মন ছিল না। ঈশ্বরের মহিমা-কথা শুনলে অন্য কথা তাঁর কাছে তৃণবৎ বোধ হতো।

তিনি মুসলমান ঘরে পালিত হলে কী হবে, হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মসভায় গিয়ে হাজির হতেন। উভয় ধর্মমতের সার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনবার চেষ্টা করতেন। তবে তাঁর মধ্যে নিছক ভাবালুতা স্থান পেতো না। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তিনি সব কিছু বিচার-বিবেচনা করতেন। প্রধানতঃ তিনি ভূতপূর্ব যোগী সম্প্রদায়ের ঘরে মানুষ হয়েছিলেন বলে যোগ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রবল। যৌগিক জ্ঞানের কাছে সাধারণ আচারসর্বস্ব ধর্মানুষ্ঠান উত্তম বলে মনে হয়নি। কবীর যৌবনকালে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ-জনের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু কারও ধর্মমত তাঁর মনে বিশেষ করে রেখাপাত করতে পারে নি। তাই তাঁর অমৃত-লাভেচ্ছু মন সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকতো অমৃত লাভ করার জন্যে। বাড়ির কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি চলে আসতেন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ-জনের কাছে। তাঁদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখনো নিজের নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন। বাড়ি থেকে ডাক আসতো। তিনি যেতেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তর্কের মীমাংসা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তর্ক করতেন। কিন্তু তাতে করে অন্তরে পেতেন না শান্তি। তাই শান্তির অন্বেষণে তিনি ছুটতেন দূর দূরান্তর স্থানে। সময়ে সময়ে কয়েক দিন ধরে বাড়িতে উপস্থিত থাকতেন না। নীরু ও নীমা ভেবে অস্থির হতো। ভাবতো, আল্লা যদি বা একটি ছেলে জুটিয়ে দিলেন তো তাঁকে নিয়ে নেবার ইচ্ছে করছেন। তাইতো কবীরকে ঘরে রাখা যাচ্ছে না।

এমন সময় কে একজন এসে বললে, ওর বিয়ের বয়স হয়েছে। একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে ওর বিয়ের বন্দোবস্ত করো।

তাই শুনে নীরু ও নীমা বিয়ের ব্যবস্থা করতে লাগলো। কিন্তু কবীর রাজী হলেন না। বললেন, জীবনে ঈশ্বরকে লাভ করাই

হচ্ছে জীবের প্রধান ধর্ম। আমি তাঁকে লাভ করতে চাই। বিয়ে করে সংসারে আবদ্ধ হতে আমি চাই না।

একজন পড়শী বললে, বিয়ে করেও তো মানুষ ঈশ্বরকে পায়। তুমি কেন তবে বিয়ে করবে না? তাছাড়া বিয়ে না করলে তোমাকে বুড়ো বয়সে দেখবে কে?

এই রকম কথা বারংবার শোনার পর কবীরের মনে কিছুটা পরিবর্তন এলো। অবশেষে তিনি বিবাহে রাজী হলেন। লুই নামে এক মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন।

॥ ছয় ॥

বিয়ে তো হলো। কিন্তু স্বভাবউদাসী কবীরের মন শান্ত ও সংযত হলো না। তিনি সর্বদা ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেখানে ভগবান বা আল্লার বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হতো সেখানে গিয়ে বসতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। অনেক জায়গায় তিনি নিদারুণ অপমান ও অনাদর পেয়েছেন। তারা তাঁকে মুসলমান জোলা বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, একজন নীচ লোকের পক্ষে ধর্মে অধিকার হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু তার জন্যে কবীরের মন একটুও দমে নি। কেন দমবে। তিনি বিধির বিধানে এই পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর কর্ম তিনি করে যাবেন। কে পথরোধ করবে? এমন শক্তি আছে কার? ঈশ্বরের ক্ষমতার কাছে—দৈবশক্তির কাছে মানুষী ছলচাতুরী প্রমুখ যাবতীয় শক্তি হয় পরাভূত।

কবীর কখনো হিন্দুদের ধর্মসভায় যেতেন, কখনো বা মুসলমান ধর্মমন্দিরে। তখন দেশে ধর্মের নামে বিভিন্ন গোঁড়া সম্প্রদায়

গজিয়ে উঠেছিল আনাচেকানাচে। তাদের বাহ্যিক আড়ম্বরই ছিল সার, ধর্মের ভাব কিছুমাত্র ছিল না। আচারসর্বস্ব মন নিয়ে অসহায় জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালাতো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই মুখোসপরা অভিনয়ের জন্যে হিন্দুধর্মের মান নীচে নেমে গিয়েছিলো। অপর পক্ষে ইসলাম ধর্মেও এসেছিলো যথেষ্ট গলদ। অনেক গোঁড়া কাজি ইসলামের দোহাই দিয়ে নিজেদের সুবিধামত ধর্মকে জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য এবং অর্থ রোজগারের অভিনব উপায় করে তুলেছিলো। ফলে নিরীহ জনমানব তাদের সুকৌশল অত্যাচারের জালে পড়ে নিঃষ্পেষিত হয়ে পড়লো।

মহাত্মা কবীরের উদার হৃদয় ধর্মের নামে এমন অত্যাচার সহ্য করতে পারলো না। তিনি দূর হতে তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখতেন এবং সমালোচনা করতেন। তাঁর সংযত এবং শাণিত সমালোচনা অনেক গোঁড়া কাজি ও পুরোহিতদের ছদ্মবেশ নষ্ট করে দিয়েছিলো।

ধর্মস্থানে গিয়ে দিনের অধিকাংশ সময় নষ্ট করতেন বলে স্ত্রী লুই এবং মা নীমা মাঝে মাঝে অভিযোগ করতেন। পিতা নীরুও বলতেন, তাঁত বুনে কিছু কাপড় ও গামছা নিয়ে হাটে যাও কবীর। দু'চার পয়সা হাতে আসবে! তাই দিয়ে সংসার চালাবে।

কবীর তাদের কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করতেন না। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন ধর্মের মুখোশ খুলে তার আসল রূপ নিরীক্ষণ করতে। এর জন্যে তাঁকে যদি অতিবড় নির্মম অত্যাচারও সহ্য করতে হয় তাও তিনি করবেন।

স্ত্রী লুইয়ের কাছে অনেকে আসতো। এসে বলতো, তুই বশ করতে পারছিস না। তোর রূপ আছে, যৌবন আছে। মেয়েছেলেদের এসব তো মহারত্ন। এসব ঐশ্বর্য যার আছে তার পক্ষে কিসের দৈন্য পুরুষকে বশ করতে!

বন্ধুবান্ধবীদের কাছ থেকে বারংবার এসব কথা শোনার পর লুইয়ের মন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একদিন সে স্থির করলো, স্বামীর

উদাসীন মনকে ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে আনবে, বশীভূত করবে তাঁকে তাঁর অনিন্দিত রূপ-যৌবনের মদিরায়। সেই অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলো লুই।

একদিন অধিক রাত করে বাড়ি ফিরেছেন কবীর। বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাড়ির লোকজন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ জেগে নেই। কবীর অনেকক্ষণ ধরে দরজায় কড়া নাড়লেন। কারও কোন সাড়াশব্দ পেলেন না।

তখন তিনি ফিরে চললেন। পথে পাহারাদারের সঙ্গে দেখা হতে সে সন্দেহ করলো, এত রাতে কোথায় যাচ্ছ? কোন বদ্ মতলব আছে নাকি?

রহস্য করে কবীর বললেন, হ্যাঁ, আছে।

চোখ রাঙিয়ে প্রহরী প্রশ্ন করলো, কি সেই অভিসন্ধি? জানতে পারি কি?

কবীর বললেন, জেনে কি হবে? তাহলে ত আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখবে। আমি তোমাদের তৈরী কারাগারে বন্দী হতে চাই না।

পাহারাদার মুচকি হাসলো। মনে মনে ভাবলো, একজন গরীব মুসলমান জোলার মুখে এই কথা!

তখন সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো, বিয়ে হয়েছে কি?

কবীর বললেন, হ্যাঁ।

—তবে বৌকে ছেড়ে বাইরে বেড়িয়েছ কেন? যাও, বাড়ি ফিরে যাও। দেখোগে তোমার বৌ কার সঙ্গে……

পাহারাদারের কথা সমাপ্ত না হতেই কবীর উত্তেজিত ভাবে বললেন, চুপ করো। না জেনে কোনো কথা বলা উচিত নয়। আমি কোথায় যাচ্ছি, কী জন্যে যাচ্ছি সে কৈফিয়ত তোমাকে দেবো না। দেবো একজনের কাছে। তিনি হচ্ছেন আমার পরম বন্ধু আল্লা, হিন্দুদের ঈশ্বর।

কবীরের মুখে এমন উচ্চভাবের কথাবার্তা শুনে চমকে উঠলো পাহারাদার। বললে, না মিঞা, আমি তোমাকে আর কিছু বলবো না। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি সাধারণ লোক নও।

এই বলে পথ ছেড়ে দিলো পাহারাদার। কবীর ধীর পদক্ষেপে পথ দিয়ে হেঁটে চললেন।

কৌতূহল, আনন্দ ও বিস্ময়ের পুঞ্জ নিয়ে তাকিয়ে রইলো পাহারাদার।

কবীর এলেন গঙ্গার তীরে। নির্জন পরিবেশের মধ্যে বসে ধ্যানমগ্ন হলেন। প্রার্থনা করলেন ঈশ্বরের কাছে—দয়াময়, আমার প্রতি সদয় হও। আমাকে কৃপা করো।

দীর্ঘ একটা রাত কাটিয়ে দিলেন কবীর গঙ্গার নির্জন তীরে। মুখে ঈশ্বরের নাম নিলেন। মনে মনে ভাবলেন, বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ভাল হয়েছে। এমনিভাবে যেন চিরদিনের জন্যে তাঁর সামনে মায়াময় সংসারের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। খুলে যায় আর এক সংসারের দরজা—যে দরজা দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করলে দর্শন মিলবে প্রিয়তম ঈশ্বরের আর দিব্যানন্দের।

সারারাত্রি ঈশ্বরের কথা ভেবেছেন কবীর। কিন্তু কেমন করে তাঁকে লাভ করা যাবে তার কোন উপায় দেখতে পেলেন না। তাই অন্তরে ঈশ্বরলাভের বাসনা ক্ষুদ্র হতে বৃহতের রূপ নিতে লাগলো। ব্যাকুলতা গেলো বেড়ে।

পরদিন সকালে বাড়ি ফিরলেন কবীর। স্ত্রী লুই তাঁর চেহারা লক্ষ্য করে বিরক্ত হলো। চোখ দুটো রক্তিমবর্ণ, গাল শুকনো, চুলগুলো রুক্ষ। দেহের পোশাক-পরিচ্ছদও ময়লা। দেখে মনে হয়, কোথায় শুয়ে রাত কাটিয়েছিলেন। গায়ে ধূলোমাটি লেগেছে।

স্ত্রীকে দেখে কবীর একবার তাকালেন তার মুখের দিকে। স্ত্রী অভিমানভরে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

কবীর আর কিছু না বলে নিজের ঘরে চলে এলেন। কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীর মনে পড়ে গেল আগের দিনে তার প্রিয় সঙ্গীদের কথা। তারা তাকে রীতিমত ভর্ৎসনা করেছিল স্বামীকে বশ করতে না পারার জন্যে।

সেই কথা মনে পড়তেই দৌড়ে চলে এলো স্বামীর কাছে। রূঢ় ভাষায় বলতে লাগলো,—কাল রাতে বাড়ি ফেরো নি কেন? কোথায় রাত কাটালে?

কবীর বললেন, বাড়িতে ঠিকই এসেছিলুম। তুমি যদি বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকো তার জন্যে আমি দায়ী নই।

লুই বললে, ডাকতে তো পারতে! তার জন্যে · ··

লুই যা বলতে চাইলো তা জেনে ফেললেন কবীব। তিনি বললেন, আমি কোথাও—কারও বাড়িতে যাই নি। দরজা খোলা না পেয়ে আমি চলে গেলুম গঙ্গার ধারে। সেখানে বসে আল্লাকে স্মরণ করতে লাগলুম।

লুই বললে, তুমি সংসার সম্বন্ধে উদাসীন থাকো বলে লোকে আমাকে অনেক কথা শোনায়। প্রায়দিন অনেক রাত করে বাড়ি ফেরো। কখনো বাড়িতে থাকো না। আমার অনুরোধ, এবার থেকে তুমি বাড়িতে থেকো। আর অমন উদাসীন হয়ো না।

কবীর বললেন, লোকের কথায় কান দাও কেন? আমি কী সংসার ছেড়ে গেছি! আমি তো সংসারেই রয়েছি। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে আল্লাকে ডাকতে হয়। তিনি কৃপা করলে সব হবে। তাছাড়া আমরা মানবজীবন ধারণ করেছি। আল্লার কৃপা লাভ করার জন্যে আমাদের সাধনা করতে হবে। আমরা সর্বদা চেষ্টা করবো, আমাদের অমূল্য জীবন বা সময় যেন ব্যর্থ না হয়।

একটু থেমে কবীর বললেন, তুমি আমার কথা ভেবো না। আমি তোমারই। আমি সংসারী। এর বেশী আর কিছু আমার বলার নেই।

এই বলে কবীর স্ত্রীর মাথায় ও পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন। লুই বেশ শান্ত ভাবে বিলোল কটাক্ষে তাকিয়ে রইলো স্বামীর দিকে। স্বামীর কাছে সরে এলো। একেবারে কবীরের বুকের কাছে নিজের স্পন্দিত শরীর মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কবীরও স্ত্রীর হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করতে লাগলেন এবং আল্লাপ্রসঙ্গে ভাল ভাল কথা শোনালেন।

॥ সাত ॥

বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। কবীর আর লুই দু'জনে সংসার করছে। তাঁদের দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। একটি পুত্র অন্যটি কন্যা। পুত্রের নাম কমাল আর কন্যার নাম কমালী।

সংসারে থেকেই কবীর আল্লার উপাসনা করেন। কিন্তু একা একা কী আল্লাকে লাভ করবার পথ জানা যায়! একজন গুরুর প্রয়োজন হয়। কবীর মূর্খ ও দরিদ্র। সে কীভাবে গুরুকে বরণ করবে! জ্ঞান দিয়ে গুরুর স্বরূপ এবং জীবনদর্শন বুঝতে হবে আর অর্থ দিয়ে দিতে হবে প্রণামী।

এই দু'টিই একান্ত অভাব কবীরের জীবনে। তবু কবীর ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। মনে ছিল বজ্রবিশ্বাস আল্লাপ্রসঙ্গে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আল্লা বা ভগবান আছেন। তাঁকে একান্তভাবে ভজনা করলে পাওয়া যায়। তিনি যোগ বিশ্বাস করতেন আবার ভক্তি-ধর্মের প্রতিও ছিল সমান আস্থা। তাঁর অন্তর ভরা ছিল কোমল ও কঠোর ভাবে। তিনি বুঝতেন, আল্লাকে ডাকবো, তবে বীরের মতো ভাব নিয়ে ডাকবো। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তাঁকে ভজনা করতে হলে নিজেকে বীর হতে হবে—শক্তির অধিকার

সম্বন্ধে সচেতন হওয়া চাই। তবে গুরুবাদ তিনি বিশ্বাস করতেন। সদ্‌গুরুকে লাভ করতে পারলে আল্লার দর্শন মিলবে এই বিশ্বাস তিনি করতেন। সদ্‌গুরুকে পাবার জন্যে তিনি কখনো যেতেন হিন্দু সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে। তবে তাঁকে দেখে কেউ প্রথম প্রথম আমল দিতেন না। হিন্দুরা বলতেন, তুই ত একজন জোলার ছেলে। মুসলমান—মূর্খ। তোর মুখে এসব বড় বড় কথা কেন? ঈশ্বরকে জেনে তোর কী হবে? যা নিজের জাত-ব্যবসা নিয়ে থাক। তাতে করে সংসারে দু'চার পয়সা আসবে।

মুসলমান ফকিররা বলতে লাগলেন, তুই ত কাফের। তুই কাফেরদের সঙ্গে মেলামেশা করিস। তোর আবার আল্লাকে ভজনা করার শখ হলো কেন?

নীরবে শুনতেন কবীর। কারও কথায় কোনরকম প্রতিবাদ করতেন না। কখনো কখনো যোগীদের আখড়ায় যেতেন। তাদের যম, নিয়ম, প্রাণায়াম ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ তাঁর মনকে নাড়া দিতে পারতো না। তিনি চাইতেন সহজসরল উপায়ে আল্লাকে কাছে পেতে। সে পথ বলে দেবে কে? তেমন মহান গুরু আছেন কে? কবে তাঁর দর্শন মিলবে?

কবীরের সময়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিশেষ ধরনের সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। সে-সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার নিয়ম এবং সংস্কার মেনে চলার মতো মানসিক অবস্থা কবীরের ছিল না। বিশেষ করে তিনি এটা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতেন যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ করলেই ঈশ্বরের দর্শন মিলবে না। তাঁকে লাভ করাই হচ্ছে জীবের শ্রেষ্ঠ বাসনা। তিনি এই বিশ্বের সর্বত্র রয়েছেন। তিনি কোন বিশেষ এক মন্দির বা মসজিদে নেই। সমগ্র বিশ্ব হচ্ছে তাঁর মন্দির। যেখান থেকেই তাঁকে ডাকা যাক না কেন তিনি ভক্তের কথা শুনতে পান।

ধর্মসম্প্রদায়ের সকলরকম সংস্কার বা গোঁড়ামি হতে দূরে

থাকতেন কবীর। একাকী নির্জনে বসে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতেন।

একবার একজন সাধক এলেন কাশীধামে। তিনি রামনামে সিদ্ধ। পরম বৈষ্ণব। তাঁর নাম রামানন্দ। তাঁর সহজসরল সাধনভজনে মুগ্ধ হলেন কবীর।

একদিন চিন্তা করলেন, এই হিন্দু-সাধকের কাছে দীক্ষা নিলে মন্দ হয় না। হিন্দু হলেই বা! তাঁর কাছে মন্ত্র নিতে ক্ষতি কী! রাম-রহিম কৃষ্ণ-করিম তো এক। আমরা বাহ্যিক জাতবিচার করে ঈশ্বরের স্বরূপত্বে আনি ভেদাভেদ। আসলে ঈশ্বর এক। তিনি একস্থানে বসে আছেন। তাঁর কাছে যাবার অনেক পথ আছে। যে যে-ভাবে পারে, যার যে-পথে যাবার প্রয়োজন, সে ঠিক সেই পথ ধরে অগ্রসর হলে তাঁকে পায়।

সাধক রামানন্দ একদিন বসে আছেন নিজের আখড়ায়। কবীর গেলেন তাঁর কাছে। নিবেদন করলেন অন্তরের কাতর প্রার্থনা। রামানন্দের শিষ্যেরা শুনে বললেন গুরুকে, এ একজন মূর্খ মুসলমান। একে রামনামে দীক্ষা দিলে বৈষ্ণবধর্মের অকল্যাণ হবে। তাছাড়া ও ওদের সম্প্রদায়ের কাছে ধিক্কৃত হবে। সুতরাং আপনি ওকে দীক্ষা দেবেন না, এই হচ্ছে আমাদের বিনীত অনুরোধ।

শিষ্যদের কথা গভীরভাবে চিন্তা করলেন রামানন্দ। তিনি বৈধীভক্তি এবং রামানুগা ভক্তি উভয়কেই হৃদয়ে স্থান দিতেন। ভাবলেন, একজন ভিন্নধর্মী লোক কী পারবে এই ধর্মের পথে চলতে!

তাছাড়া তখনো পর্যন্ত তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ অহিন্দু ছিলেন না। কবীরই প্রথম এসেছেন তাঁর কাছে। কবীরের পরে অবশ্য হরিদাস মুচি, ধনা জাঠ এবং সেনা নাপিত তাঁর শিষ্য হয়।

শিষ্যদের কথা শুনে এবং অন্যান্য সবদিক বিচার-বিবেচনা করে রামানন্দ অসম্মতি জানালেন কবীরের প্রস্তাবে। অথচ মনের মধ্যে অশান্তিভাব গুমড়ে উঠতে লাগলো। তিনি আচণ্ডালকে প্রেমভক্তি

বিতরণ করতে কার্পণ্য করতেন না। ভক্ত ও বৈষ্ণব হবে যারা তাদের কাছে জাতিধর্মের গোঁড়ামি থাকবে না। রামানন্দের হৃদয়ে যে সত্যের উপলব্ধি হয়েছিল তার ফলে তিনি প্রকৃত ভক্তকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করতে আপত্তি জানালেন না। তবে অনেকসময়ে তাঁকে সমাজের প্রচলিত নিয়ম মেনে চলতে হতো। তাই তাঁর মনের অনেক ইচ্ছাই গোপন রাখতে হয়েছিল সময়বিশেষে।

ভগ্নহৃদয়ে ফিরে গেলেন কবীর। তবে তাঁর অন্তরে একান্তভাবে প্রার্থনা জেগে রইলো, যেমন করেই হোক তিনি রামানন্দের কাছে রামনামে দীক্ষা নেবেন। তিনি জীবনে অনেক সাধুসন্তের কাছে এসেছেন। কিন্তু এমনধারা সাধক তাঁর নজরে বড় একটা পড়ে নি। ওঁর চাহনি কী সুন্দর! ওঁর চলাবলা কত সহজ ও স্বাভাবিক! ওঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, স্বয়ং ঈশ্বরই বুঝি তাকিয়ে রয়েছেন কবীরের দিকে! আহা, কী সুন্দর দৃশ্য! গুরুর মধ্য দিয়েই ঈশ্বর আবির্ভূত হন। গুরু আর ঈশ্বর এক—অভেদ।

সেদিন আশাভঙ্গ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন কবীর। তবে মনের আশা একেবারে মিলিয়ে গেল না। নিচ্ছিদ্র আঁধারের গভীরে জেগে রইলো সে ক্ষীণ দীপশিখার মতো।

॥ আট ॥

মনের মতো গুরু—হৃদয়ের একান্ত আপনজনকে কাছে পেয়েও হারাতে হলো। হায়! আমার কী দুর্ভাগ্য! হে আল্লা—হে জগদীশ্বর! আমার প্রতি আপনি কী সদয় হবেন না! আগে অনেক হিন্দু সন্ন্যাসীকে আর মুসলমান পীরকে আপনি কৃপা করেছেন। আমাকে কেন তবে বিমুখ করছেন! আমার প্রতি

আপনি সদয় হোন। আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে আমাকে আপনার যোগ্য পূজারী করে নিন।

এমনিভাবে কাতর প্রার্থনা ধ্বনিত হতে লাগলো কবীরের অন্তরমন্দিরে। একান্তভাবে শরণাপন্ন হলে তবেই ঈশ্বর প্রকাশিত হন ভক্তের কাছে গুরুরূপে। কবীরের মনে আশা আছে, ঈশ্বর বা আল্লা একদিন আসবেন তাঁর কাছে। তিনি অনাগত কালের শুভ আগমনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন। তাঁর চিত্তে জেগে রইলো বীর ভাবনা—উচ্চাশা। তিনি ভাবলেন, একান্ত ইচ্ছা থাকলে এই জীবনেই ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়। হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছ থেকে রামায়ণের ব্যাখ্যা শুনেছেন। শবরীর প্রতীক্ষা তাঁর মর্মমূলে আলোড়ন এনেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শবরী শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা পেয়েছিলেন। আর কবীর এমন কী মন্দ কাজ করেছেন যে, তিনি আল্লার কৃপা হতে বঞ্চিত হবেন!

মনের মধ্যে হরষবিষাদ ভাব নিয়ে বাড়ি ফিরলেন কবীর। স্ত্রী লুই মুখ ভার করে বসেছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন কবীরের প্রতি একরাশ অভিযোগ রয়েছে।

কবীর জিজ্ঞেস করলেন, লুই, আজ তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? আমরা আল্লার রাজত্বে বাস করছি। শুনেছি তিনি আনন্দময় পুরুষ। তবে আমাদের মন কেন বিষণ্ণতায় ভরে থাকবে?

স্বামীর কথায় মন ভরলো না লুইয়ের। উত্তেজিত হয়ে বললে, তোমার কমালের কীর্তিকাহিনী শুনেছ কী?

কবীর বললেন, কী করেছে সে?

লুই বললে, কী আর করবে! পরের বাগান থেকে জিনিস চুরি করে খেতে শিখেছে। তুমি তো সংসার করো না। বুঝবে কী এসব ঝামেলা!

কবীর হেসে বললেন, ও এই খবর! এটা আর এমন কী বড়

কথা। ছোটছেলের মন তো। ওরকম একটু-আধটু করে থাকে ঐ বয়সে। তুমি ওকে কিছু বলেছ নাকি?

লুই বললে, হ্যাঁ বলেছি। ওকে খুব করে বকেছি। সেই থেকে ও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আর ফেরে নি।

কবীর বললেন, ও ফিরে এলে, ওকে আর কিছু বলো না। খোদার কৃপায় ওর মতি একদিন স্থির হবে।

ঝাঁজিয়ে উঠলো লুই, তোমার খোদা সব করবে। প্রত্যেক কথায় তাঁকে ডাকো অথচ সংসারের দুঃখও ঘোচে না।

কবীর বললেন, তাঁকে আমরা ঠিকমতো ডাকতে পারি না বলে দুঃখ ঘোচে না। তাঁকে ডাকবার পথ সুগম করার জন্যেই তো তিনি দুঃখ দিয়েছেন। দুঃখ যে তাঁরই মহান সৃষ্টি। দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের আকর্ষণ করছেন তাঁর দিকে। তুমি এ সত্য ভুলো না। ভুললে আরও বেশী কষ্ট পাবে। সুখে-দুঃখে, পাপ-পুণ্যে তাঁর শরণাপন্ন হও। তিনিই ভবপারের কাণ্ডারী। তাঁর কৃপায় আমরা সংসার-সাগরের বিপদসঙ্কুল পথ হতে পরিত্রাণ পাবো।

এই কথা বলতে বলতে কবীরের সর্বাঙ্গে এলো এক অভূতপূর্ব শিহরণ। তাঁর আর কিছু বলা হলো না। দুই নেত্র বেয়ে প্রেমাশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। তিনি তখন স্মরণ করতে লাগলেন রামানন্দের কথা—তাঁর হাবভাব। কবীর দেখেছেন রামানন্দকে। তিনি যখন ভক্তদের সামনে উপদেশ দিতেন, তখন তাঁর গণ্ডদেশ বয়ে অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু ঝরতো। এমন ঈশ্বরপ্রেমিক না হলে কী ঈশ্বরকে পাওয়া যায়! মহাপ্রেমিক ঈশ্বর যে আমাদের কোলে নেবার জন্যে উদ্গ্রীব। আমরা এক পা এগিয়ে গেলে ঈশ্বর যাবেন দশ পা। আমাদের মন ইন্দ্রিয়ের দাস। তাকে সংযত করলে আমরা এক মুহূর্তে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হতে পারি—ভুলতে পারি জাগতিক সংসারের সুখ-দুঃখ।

॥ নয় ॥

গুরু আমাকে বিমুখ করলেও আমি কিন্তু গুরুকে বিমুখ করবো না। আমি তাঁকে চাই। তাঁর মাঝেই বিরাজ করছেন আমার ইষ্টদেবতা। মনে মনে মতলব করেন কবীর।

আবার কখনো মনে পড়ে যায় হিন্দুশাস্ত্রোক্ত গুরুমাহাত্ম্য। তার সরল স্তোত্র ও ব্যাখ্যা তিনি শুনেছেন হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে,—

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'

অর্থাৎ—গুরুই ব্রহ্মা। গুরুই বিষ্ণু। গুরুই দেবাদিদেব মহেশ্বর। গুরুই পরম ব্রহ্ম। সেই গুরুকে নমস্কার করি।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর আকার, যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপে আছেন, যিনি ব্রহ্মপদ দর্শন করান, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

অজ্ঞান অন্ধকারে, অন্ধজনের চক্ষু, যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দিয়ে উন্মীলিত করেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

আহা কী সুন্দর কথাগুলি! কবীর মূর্খ কে বললে? স্কুল বা পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন নি, আক্ষরিক জ্ঞান নেই, তাই বলে কী সে মূর্খ! পুঁথিসর্বস্ব জ্ঞানই কী সব! পুঁথির বাইরে যে পড়ে রয়েছে বিরাট বিশ্বজগৎ। সেই জগতের খবরাখবর পুঁথিতে ধরবে না আর ধরাও সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। আগেকার দিনে ক'জন কটা বই লিখেছে? সব কথা, সকল তথ্য ও তত্ত্ব তো মনে মনে, মুখে মুখে

বিরাজ করতো। একজনের মাধ্যমে আর একজনের কানে যেতো। তিনি আবার বলতো অন্যজনকে। এমনিভাবে জ্ঞানের আলো চলে এসেছে একজনের কাছ থেকে বহুজনের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল হতে।

কবীর মূর্খ নন। তাঁর জ্ঞান পুঁথিগত নয়, শ্রুতিগত। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সাধুসন্ন্যাসীদের কাছ থেকে অনেকবার অনেক আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা শুনেছেন। সবগুলি মনে আছে স্মৃতিশক্তির জোরে। তাঁর উচ্চারণ শুদ্ধ নয় কিন্তু অর্থ পরিস্ফুট।

কবীরের বড় আশা, তিনি রামানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবেন। কিন্তু রামানন্দ তো তাঁকে দীক্ষা দেবেন না। কবীর যে মুসলমান জোলার সন্তান।

মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেন কবীর। ভাবেন, আমি দরিদ্র, মূর্খ এবং বিধর্মী হয়ে এমন কী অপরাধ করেছি! ঈশ্বর তো এসব দেখেন না। তিনি দেখেন ভক্তি। হিন্দুদের অন্যতম প্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ গীতায় তো লেখা আছেঃ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, হে পার্থ, যে ভক্তিভরে আমাকে আহ্বান জানায় আমি তাকে কৃপা করি। সে আমাকে পায়।

কবীর তো ভক্ত। তবে তিনি কেন দয়াময় ঈশ্বরের দর্শন পাবেন না! কী করলে গুরুর কৃপা লাভ করা যাবে!

যাঁর জন্যে ভাবা যায় তিনিই সে ভাবনা পূরণ করেন। কথায় আছে, যে খায় চিনি তাকে তা জোগায় চিন্তামণি। কবীরের মনে এক সুন্দর উপায় উদ্ভাসিত হলো। মনই তো সব। এই মনে যে চিন্তা আজ অঙ্কুরিত হলো, সুপ্ত বীজ থেকে কে বলতে পারে কালে সে বিরাট এক মহীরুহে পরিণত হবে না! মনে যেমন অসৎ চিন্তা আসে তেমনি সৎ চিন্তাও আসে। মন যে দেহরথের সারথি। আর রথের আরোহী হচ্ছে আত্মা। সারথি রথ চালায়, মন নিয়ে বেড়ায় আত্মাকে। কান ধরে টানলে যেমন, মাথা চলে আসে, তেমনি মন ধরে টানলে আত্মা জেগে ওঠে। আত্মা জাগলে পর-

মাত্মার দর্শন পাওয়া যায়, হৃদ্‌কন্দরে তাঁর দিব্যস্থিতি উপলব্ধি করা যায়।

কবীরের যখন মন হয়েছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই গুরুকৃপা পাবেন। শ্রীগুরুর পাদপদ্মে মোহগ্রস্ত জীবমন একবার সমর্পণ করলে, সেই মন জীবন্মুক্ত হয়ে আত্মার সঙ্গে মিতালী করে পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়।

এবার সেই প্রচেষ্টার প্রকাশ হয়েছে কবীরের জীবনে। তিনি নবজীবন লাভ করতে চলেছেন। এইটি হচ্ছে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।

পরম ভাগবত বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি রামানন্দ কাশীতে রয়েছেন। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি যান গঙ্গায় অবগাহন করতে। মুখে রামনাম। সেই অখণ্ড নামযজ্ঞে মনকে নিয়োজিত রাখেন পরম ভক্ত রামানন্দ। তাঁর কথাবার্তায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে এবং সর্বকর্মে নিত্য জড়িত থাকে সেই অপূর্ব রামনাম। ঈশ্বরের অন্যতম অবতার রাম। কৃষ্ণও এক অবতার। যে কৃষ্ণ সেই রাম। ত্রেতায় রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ। যার কাছে যে নামটি ভাল লাগে তিনিই সেই নাম গ্রহণ করে তৃপ্তি পান, সিদ্ধিলাভ করে জীবনগতির মোড় ফেরান।

কবীর ভাবলেন, গুরু আমাকে নিজে থেকে আহ্বান না জানালে ক্ষতি নেই। আমিই সুকৌশলে তাঁর আহ্বান আদায় করে নেবো। তিনি যখন ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নানে যাবেন, সেইসময় আমি সিঁড়ির কাছে শুয়ে থাকবো। তাঁর নজরে আমি পড়লে তখুনি উদ্ধার হয়ে যাবো তাঁর কৃপালাভ করে।

যেমন ভাবা অমনি কাজ। সেদিন সারারাত ঘুমোন নি কবীর। স্ত্রী লুইয়ের মনে বড় অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। ভাবলে, স্বামী আজ ঘুমুচ্ছেন না কেন? কোনোদিন তো এমনটি হয় না। আজ তিনি এমন চঞ্চলমনা কেন?

চিন্তার শেষ খুঁজে পেলো না লুই। যত চিন্তা করে ততই তার

রেশ যায় দীর্ঘ হয়ে। দীর্ঘ হতে হতে এমন এক সময় আসে যখন সে আর চিন্তা করতে পারে না। মানসিক শক্তি হারিয়ে মগজের স্নায়ুগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে লুই। শান্তির অতল গহ্বরে মন চলে যায়। যতক্ষণ ঘুমোয় ততক্ষণ শান্তি পায়, ঘুম ভাঙলেই অশান্তি।

কবীর দেখলেন, স্ত্রী নিদ্রা গেছে। তবে আর আশঙ্কা কিসের! চুপিসারে গৃহত্যাগ করা যাক এবার। তাহলে কোনোরকম বাধা আসবে না স্ত্রীর তরফ থেকে।

মাঝরাত। চারদিক নির্জন। মাঝে মাঝে দু' একটি নিশাচর বিহঙ্গের ডাক শোনা যেতে লাগলো। কবীর নিঃশব্দে ঘরের কপাট খুলে বাইরে এলেন। তাঁর বাসা থেকে গঙ্গা বেশীদূর নয়। ধীরে ধীরে চলে এলেন গঙ্গাতীরে। ইট দিয়ে বাঁধানো ঘাটে এক এক পা দিয়ে নামলেন। ভাবলেন, একবার গঙ্গামাকে স্পর্শ করে দেহমন পবিত্র করে তারপর শুয়ে পড়বেন সিঁড়ির ওপর।

সিঁড়ির এক একটি ধাপ পার হয়ে কবীর এলেন গঙ্গার কিনারে। হাঁটুসমান জলে নেমে হেঁট হয়ে হাত দিয়ে সামান্য জল তুলে নিয়ে মাথায় ও চোখেমুখে দিলেন। আচমনও করলেন দু' একবার। তারপর আস্তে আস্তে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেন। ওপরের ধাপে শেষ সিঁড়ির নীচে এসে গায়ের কাপড়টা খুলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন কবীর।

গঙ্গার স্নিগ্ধ-শীতল হাওয়া লেগে শরীর জুড়িয়ে গেল! ঘুম এলো চোখে। কিন্তু ঘুমুলেন না কবীর। আপ্রাণ শক্তি নিয়ে জেগে থাকার চেষ্টা করলেন।

অবশেষে এলো সেই শুভমুহূর্ত। ব্রাহ্মমুহূর্ত। দিন ও রাত্রির মিলনলগ্ন। রজনী শেষ হয়ে দিন আসছে। রজনীর সমাপ্তি আর দিবসের আগমন—এই দুই কালের মিলনমুহূর্ত বড় পবিত্র। সাধক ও যোগীরা এইসময় গাত্রোত্থান করে গঙ্গাস্নানে যান।

স্নান শেষ হলে বসেন সিদ্ধাসনে দেবার্চনা এবং ইষ্টনাম জপবার জন্যে।

পরম বৈষ্ণব রামানন্দ এসেছেন গঙ্গাতীরে। এক একটি সিঁড়ি ভেঙে ঘাট্ দিয়ে গঙ্গায় অবতরণ করলেন। মুখে তাঁর রামনাম।

নামমন্ত্র জপ করতে করতে অবগাহন করলেন পুণ্যসলিলা গঙ্গার কোলে। সর্বপাপনাশিনী পতিতপাবনী গঙ্গার সুশীতল জলে অবগাহন করে স্নিগ্ধ মনে উঠে আসছেন রামানন্দ গঙ্গার কোল হতে। সিক্ত বসনে সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে উঠছেন। ওপরের দিকে শেষ সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। অনুভূতিবলে বুঝতে পারলেন, কী যেন ঠেকলো তাঁর পায়ে। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, কাপড়মুড়ি দিয়ে কে যেন শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

একটু দূরে সরে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কে এখানে শুয়ে?

তখন চারদিকে ধূসর আলো নেমেছে। আবছায়া অন্ধকারে জীর্ণবাস একজন মুসলমানকে দেখতে পেলেন রামানন্দ।

দেখামাত্র চিনে ফেললেন তাঁকে। ভাবলেন, এ তো সেই লোক! এ তো আমার কাছে গেছিল দীক্ষা নেবার জন্যে!

সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেলো আরও অনেক স্মৃতি কবীরদাসের মুখপানে তাকাতে তাকাতে বৈষ্ণব রামানন্দের।

ভাবলেন, একদিন তিনি কবীর সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তাঁর জনৈক ব্রাহ্মণশিষ্যের কন্যাকে লক্ষ্য করে। এই মানুষটি আর কেউ নয়। ইনি সেই কন্যার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। ইনি ছদ্মবেশী মহাপুরুষ। যুগসন্ধিক্ষণে এসেছেন হিন্দু-মুসলমান সমাজের হিতের জন্যে।

কবীরের দিকে তাকিয়ে বললেন রামানন্দ, আমি তোমার কথা ভালোভাবেই জানি। তুমি দিবারাত্র রামনাম জপ করো। তাহলেই বুঝতে পারবে তোমার স্বরূপ এবং কর্ম। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান সমাজে ধর্মের নামে অনেকরকম গোঁড়ামি রয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা

হচ্ছে ধর্মের শত্রু। প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ হচ্ছে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে সমানভাবে ভালবাসা। ধর্মের কাছে কেউ ছোট নয়, কেউ বড়ও নয়। সকলেই সমান। বদ্ধ সংসারাসক্ত জীব মোহগ্রস্ত হয়ে ধর্মের নামে ব্যভিচার করে. হে বৎস! তুমি উপযুক্ত সময়ে আমার কাছে দীক্ষিত হলে। তোমার সাধনশক্তি জীবকল্যাণে নিয়োগ করবে। তোমাকে গৃহত্যাগী সাধু হতে হবে না। গৃহে থেকে তুমি রামমহিমা প্রচার করো।

পরিশেষে গুরু রামানন্দ শিষ্য কবীরকে আশীর্বাদ করে বললেন, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। তুমি যা বাসনা করছো তা পূরণ হবে। আমার শক্তি সবসময়ে তোমার সঙ্গে থাকবে। আর আমি তোমার মধ্যে মহৎ গুণ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তুমি সৎ ও বিনয়ী। এই দুটি গুণ হচ্ছে ধার্মিকের জীবনে ঐশ্বর্য—ঐশ্বরিক শক্তিলাভের উৎকৃষ্ট পন্থা।

এতোদিনে কবীরের আশা পূর্ণ হলো। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এলো ঈশ্বরের করুণা গুরুর মাধ্যমে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানালেন গুরুদেবকে।

তাঁর অন্তরাত্মা কম্পিত করে গুঞ্জরিত হলো মধুর কণ্ঠস্বর,—

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'

তারপর আপনা হতেই জপ করতে লাগলেন রামনাম। কবীর ভাবতেই পারেন নি, কীভাবে তাঁর কণ্ঠ হতে এমন সুন্দর নাম এবং মন্ত্র উচ্চারিত হলো। যত ভাবেন ততই মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এ গুরুকৃপা ছাড়া আর কী। তাঁর কৃপা হলে সবরকম অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়।

সেদিন গুরুকে বারংবার প্রণাম করে ফিরে এলেন কবীর। আসার আগে গুরু পুনরায় দু'একটি উপদেশ দিলেন। বললেন, ঈশ্বর নিরাকার আবার তিনি সাকার। তাঁকে যে-লোক যে-ভাবে ডাকে,

তিনি তাকে তেমনভাবে কৃপা করেন। সংস্কার এবং শাস্ত্রবিধিমতের পথে সাধনা করে তাঁর কৃপা পাওয়া যায়, আবার অহেতুক ভক্তিপ্রভাবে তাঁর করুণা মেলে। যার যে-ভাব ভালো লাগে, সে সেইভাবে তাঁকে সাধনা করে তাঁর অপার কল্যাণময় করুণা লাভ করতে পারে। এইটিই হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্মের সারকথা। ঈশ্বর এক—তিনি পুরুষ। ভক্ত হচ্ছে প্রকৃতি। সে প্রকৃতিভাবে তাঁকে সেবা ও পূজা করবে। পরিণামে তাঁতেই লীন হবে। পত্নী যেমন পতিকে ভালবাসে, তেমনি স্ত্রীরূপে ভক্ত পতিরূপ ঈশ্বরকে ভালবেসে তাঁতে তার মন-প্রাণ-দেহ সর্বস্ব সমর্পণ কবে আত্মহারা হয়ে যায় এবং বিমল আনন্দ উপলব্ধি করে।

এমনি অনেক উপদেশ দিলেন রামানন্দ ভক্ত কবীরকে। তাঁর উপদেশাবলীর মধ্যে কতকগুলি কথা সম্পূর্ণ বোধগম্য হলো না কবীরের। তিনি তাকিয়ে রইলেন গুরুর মুখের দিকে।

রামানন্দ বললেন, আমি তোমার মনোভাব বুঝতে পেরেছি কবীর। আজ আমার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারছো না। কিন্তু দু'দিন পরে পারবে। তুমি একমনে রামনাম জপ করে যাও। সংসারের বিভিন্ন কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই মন্ত্র জপ করো। তার ফলে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে। পরিণামে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ ভাগবত।

॥ দশ ॥

গুরু রামানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল কবীরের জীবনে। এখন কিছু কিছু অনুভূতি এবং উপলব্ধি হতে লাগলো। সংসারে তিনি ছিলেন পদ্মপত্রের ওপর জলকণার মতো। সব কাজ করতেন অথচ কারও

সঙ্গে লিপ্ত থাকতেন না। কোনো কর্মে ছিল না তাঁর আসক্তি। করতে হয় করছি বা কর্তব্যের খাতিরে করছি—এই ছিল তাঁর জীবনবাণী। তাঁর জীবনে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার প্রভাব দেখা যায়,—

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥'

অর্থাৎ, তোমার লক্ষ্য হবে কেবল কাজ করে যাওয়া। এর ফলের দিকে তুমি ভাববে না। কর্মই তোমার জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু কর্মে তোমার আসক্তিও থাকবে না। তিনি ছিলেন স্বভাবউদাসী। তা বলে তাঁর উদাস স্বভাবের কাছে কর্তব্য কর্ম অবহেলিত হতো না। আবার তিনি অধিক পয়সা রোজগারের স্বপ্নে সময় নষ্ট করতেন না। জীবিকা অর্জনের জন্যে যেটুকু না করলে চলে না, তিনি ঠিক সেইটুকু করতেন। তার বাইরে যেতেন না। কিন্তু ঘোর বিষয়ী স্ত্রী লুই এবং জননী নীমা কবীরের এই ভাব পছন্দ করতেন না। তাঁরা কবীরের কাছে সংসারের নানারকম অভাব-অভিযোগ পেশ করতেন। কখনো কখনো নীমা কান্নাকাটি করে মনের ক্ষোভ ও দুঃখ নিবেদন করতেন। তাই দেখে কবীর বলতেন,—

'মুসি মুসি রোবৈ কবীর কী মায়,
ঐ বারক কৈসে জীবহি রঘুরায়।
তননা বুননা সম তজ্যো হৈ কবীর,
হরি কা নাম লিখি নিয়ো শরীর।'

অর্থাৎ, দুঃখ করে করে কাঁদতে লাগলো কবীরের মা। হে রঘুরায়, এবার কেমন করে বাঁচবো। কবীর শরীরের ওপর লিখে নিয়েছে হরির নাম আর তানা দেওয়া, কাপড় বোনা সব ছেড়ে দিয়েছে।

যাঁর এই বিশ্বসংসার—যিনি সর্বজীবের গতিনিয়ামক, তিনিই দেখবেন আর পাঁচজনের মত কবীরের সংসার। তাছাড়া কবীর হচ্ছেন ভক্ত। ভক্তের ভার বহন করেন ভগবান। কবীর বেশ

ভালো করে জানতেন গীতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি—ভক্ত অর্জুনকে লক্ষ্য করে,—'কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' অর্থাৎ, হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চিত জেনো, আমার ভক্ত কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। কবীর যে হরিভক্ত। হরির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তাঁর আর ভয় কিসের। হরিই দেখবেন তাঁর সংসার। তাই পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে গঞ্জনা শুনে ভক্ত কবীর বলতেন,—

'দীন দয়াল ভরোসে তেরে
সভ পরবারু চঢ়াইআ বেড়ে।'

অর্থাৎ, হে দীনদয়াল! তোমার ওপরই আমার ভরসা। আমার সব পরিবারকে তোমারই নৌকোয় চড়িয়ে দিলুম।

কবীর কোন অন্যায় করেন নি। কারণ তিনি ভক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রেয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'

অর্থাৎ, হে অর্জুন! আমার প্রতি মন রাখো, আমার ভক্ত হও, আমাকে অনুসরণ করো। আমি নিশ্চয় করে বলছি, তুমি আমার প্রিয়। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাকে শরণ করো। আমি তোমাকে সকলপ্রকার পাপ হতে রক্ষা করবো। শোক করো না।

ভক্ত কবীর ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে চলেছেন। তিনি বীর সাধক। ঈশ্বরে নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছেন। তাঁর সংগ্রাম হচ্ছে নামজপের মাধ্যমে অন্তরে দৈব-শক্তির সঞ্চয়। অন্তর দিব্যভাবে পূর্ণ হলে তবে জাগবে ঐশী শক্তি। সেই শক্তি দিয়ে সকলের মন জয় করেন কবীর। সংসারের তুচ্ছ

কাজে দিবারাত্র মনকে ব্যস্ত রাখলে সাধনপথে তিনি অগ্রসর হবেন কীভাবে! তিনি যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে—সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রেমময়ের দর্শনলাভ করতে চান। তিনি পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবদের পক্ষে মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। তবে ঐ প্রকার সাধনভজন কঠিন এবং সাধনসাপেক্ষ। কিন্তু যে প্রকৃত ভক্ত, তাঁর কাছে সকলপ্রকার সাধনাই সরল ও তরল হয়ে যায় ভক্তির সোনালী পরশে।

কবীর ভক্ত। ভক্ত চায় ভগবানকে লাভ করতে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভগবানকে লাভ করতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সুখ নেই, শান্তিও নেই।

কবীর বলছেন,—

'সাঈঁ বিন দরদ করেজে হোয়।
দিন নহিঁ চৈন রাত নহিঁ নিঁদিয়া, কাসে কহুঁ দুখ হোয়।
আধী রতিয়াঁ পিছলে পহরবা, সাঈঁ বিনা তরস তরস রহী সোয়।
কহত কবীর সুনো ভাঈ প্যারে, সাঈ মিলে সুখ হোয়॥

অর্থাৎ, স্বামীর বিরহে হৃদয় ব্যথাতুর। দিনেও স্বস্তি নেই, রাতেও ঘুম নেই। দুঃখ কাকে বলবো। অর্ধেক রাত গেল, রাতের শেষ প্রহরও গেল কেটে। কিন্তু স্বামী এলেন না। তিনি 'এই আসছেন এই আসছেন' বলে প্রতীক্ষা করে করে শেষে ঘুমিয়ে পড়লুম। কবীর বলছে, আদরের ভাইটি আমার শোন, স্বামীকে পেলেই তবে সুখ হয়।

কিন্তু সেই স্বামীকে পাওয়া যাবে কীভাবে? প্রেম ও ভক্তির সাহায্যে তাঁকে লাভ করা যায়।

কবীর বলছেন,—

'জীব মহলমেঁ সিব পহুনবাঁ, কহাঁ করত উনমাদ রে।
পহুঁছা দেবা করিলৈ সেবা, রৈন চলী আবত রে।

জুগন জুগন করৈ পতীছন, সাহবকা দিল লাগ রে।
সূঝত নাহিঁ পরম-সুখ-সাগর, বিনাপ্রেম বৈরাগ রে।
সরবন সুর বুঝি সাহেবসে, পূরণ প্রগট ভাগ রে।
কহৈ কবীর সুনো ভাগ হমারা, পায়া অচল সোহাগ রে।'

অর্থাৎ, জীবের মহলে শিব (পরমাত্মা) অতিথি। ওরে উন্মাদ, কী করছিস তুই! যে দেবতাকে পাওয়া গেছে, তাঁরই সেবা করে নে। রাত যে চলে আসছে। যুগ যুগ প্রতীক্ষা করার পর তবে প্রভুর প্রতি প্রেম জন্মে। প্রেম ও বৈরাগ্য ছাড়া পরম সুখসাগরের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে শব্দ কানে শুনেছিলে তা প্রভুর কাছ থেকেই এসেছে জেনে রেখো। এতে তোমার পরিপূর্ণ সৌভাগ্যই প্রকাশ পেয়েছে। কবীর বলছে, শোন তোমরা আমার ভাগ্যের কথা। আমি অবিচলিত স্বামী-সোহাগ পেয়েছি।

প্রেমই হচ্ছে সাধনার মূলমন্ত্র। বিশেষ করে ভক্তের পক্ষে প্রেমই হচ্ছে সাধনপথের আলো—একান্ত সহায়। ভক্ত কবীর প্রেমবলে তাঁর ইষ্টদেবকে লাভ করেছিলেন। পরম বৈষ্ণবী মীরা-বাঈও বলেছেন, 'বিনা প্রেমসে নাহি মেলে নন্দলালা।' অর্থাৎ, প্রেমছাড়া নন্দলালকে পাওয়া যায় না। যুগাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। এই প্রেম-প্রভাবেই ভক্ত হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের কর্ম সম্পাদন করে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজন হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রেমলীলা করে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। সুতরাং প্রেমের শক্তি অমোঘ। প্রেম সাধকহৃদয়ের ঐশ্বর্য—সাধনার পরশমণি।

ভক্ত কবীর গুরুকৃপায় নামজপের দ্বারা হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করেন এবং তার প্রভাবেই তাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়। তিনি পরম ভাগবত। তাঁর প্রেম-ভক্তির তুলনা নেই।

॥ এগারো ॥

ঈশ্বরকে লাভ করার পর লোকহিতের জন্যে তাঁকে অনেকদিন ধরে সংসারে থাকতে হয়েছিলো। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধকদের সঙ্গে তিনি মিশতেন। সকলের কথা শুনতেন। প্রয়োজন হলে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করে দেখতেন তাঁদের ধর্মকথা। সত্য বলে মনে করলে তিনি নির্বিচারে তা গ্রহণ করতেন।

গুরু কে ? কবীর বলতেন, ঈশ্বরই গুরু। তিনি রাম বা রহিম, আল্লা বা ঈশ্বর যেই হোন না কেন, তিনি কবীরের গুরু। ঈশ্বরই গুরুর মধ্য দিয়ে শিষ্যের বা ভক্তের কাছে আসেন। কবীর বলছেন,—

'জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ ঔর মুল্লুক কেহি কেরা।
তীরথ—মূরত রাম-নিবাসী বাহর করে কো হেরা।
পূরব দিসা হরিকৌ বাসা পচ্ছিম অলহ মুকামা।
দিলমেঁ খোজ দিলহিমেঁ খোজ ইহেঁ করীমা-রামা।
জেতে ঔরত-মরদ উপানী সো সব রূপ তুম্হারা।
কবীর পোঁগড়া অলহ—রামকা সো, গুরুপীর মোরা।'

অর্থাৎ, যদি খোদা থাকেন মসজিদে তবে বাকী জগৎটা কার ? তীর্থ-মূর্তি সব রামের মধ্যেই রয়েছে। বাইরে কে খুঁজে মরে। পূবদিকে হরির বাস আর পশ্চিমে নাকি আল্লার মোকাম। অন্তরে খোঁজ, কেবলমাত্র অন্তরেই খোঁজ। এখানে আছেন করিম। এখানেই আছেন রাম। হে রাম, যত নরনারী সব তোমারই রূপ। কবীর আল্লা রামের ছেলে। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।

ঈশ্বর রয়েছে সর্বত্র। তিনি কোন বিশেষ মন্দিরে বা মসজিদে

নেই। এই বিশ্বচরাচরই হচ্ছে তাঁর মন্দির। আবার ব্যক্তির হৃদয়ও তাঁর মন্দির। সেইটিই হচ্ছে আসল মন্দির। সেখানে ঈশ্বরের স্থিতি উপলব্ধি হলে তখন আত্মদর্শন হয় এবং তার ফলে বিশ্বকে মনে হয় অতি আপনার জন। আত্মপর ভেদাভেদ জ্ঞান হয় লুপ্ত।

আত্মদর্শনের জন্যে নীরব সাধনার প্রয়োজন। আর তার জন্যে প্রয়োজন গুরুকৃপা। অন্তর বিকাশের জন্যে সাধনভজন করা প্রয়োজন। সেখানে রয়েছে ইষ্টদেবতা।

গুরুকৃপা এবং সাধনভজনের জন্যে ঘটে আত্মদর্শন এবং তার ফলে লাভ হয় ইষ্টদেবকে। কবীরের গুরু হচ্ছে পূর্ণ জ্যোতিস্বরূপ। কবীর বলছেন,—

'বেদ কহে সরগুণকে আগে নিরগুণকা বিসরাম।
সরগুণ-নিরগুণ তজহু, দেখ, সবহি নিজধাম।
সুখ-দুখ বহাঁ কছু নহিঁ ব্যাপৈ, দরসন আঠো জাম।
নূরৈ ওঢ়ন নূরৈ ডাসন, নূরৈকা সিরহান।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, সতগুরু নূর তমাম॥'

অর্থাৎ, বেদ বলে সগুণের সমাপ্তি ঘটে নির্গুণে। ওগো সৌভাগ্যবতী, সগুণনির্গুণ ত্যাগ করো। নিজ ধামের মধ্যে সবকিছুকে দেখ। ওখানে সুখদুঃখ কিছুই অনুভূত হয় না। অষ্টপ্রহর দর্শন মেলে। সেই ধামে জ্যোতিরই ওড়না, জ্যোতিরই বিছানা আব জ্যোতিরই বালিশ রয়েছে। কবীর বলছে, সাধুরে ভাই, শোন সদ্‌গুরু পূর্ণ জ্যোতিস্বরূপ।

সদ্‌গুরুর দর্শন পেলে জন্মের সংস্কার চলে যায়। তখন ঈশ্বরদর্শন সহজ হয়। কবীর বলেছেন,—

'মৈ অপনে সাহব সঙ্গ চলী।
হাথমেঁ নরিয়ল মুখমে বীড়া, মোতিয়ন মাঁগ ভরী।
লিল্লী ঘোরী জরদ বছেড়ী, তাপৈ চঢ়িকে চলী॥

নদী কিনারে সতগুর ভেঁটে, তুরত জনম সুধরী।
কহেঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, দোউ কুল তারি চলী॥'

অর্থাৎ, আমি আমার নিজের প্রভুর সঙ্গে চলবো। হাতে নারকেল নেবো, মুখে দেবো পানের খিলি। সীঁথি ভরে মোতি পরব। নীল ঘোড়ীর হলদে রঙের বাচ্চা তার পিঠে চড়ে যাব। নদীর ধারে সদ্ গুরুর দর্শন মিলবে। অবিলম্বে আমার জন্মের সংস্কার হবে। কবীর বলছে, সাধুরে ভাই, শোন, আমি দু'কূল উদ্ধার করে

যে যে-ভাবেই সাধনভজন করুক না কেন, তাকে নিতে হবে সদ্‌গুরুর স্মরণ। তবেই তার উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সিদ্ধ হবে,—

'বহুরি নহিঁ আবনা যা দেস।
জো জো গয়ে বহুরি নহিঁ আয়ে, পঠবত নাহিঁ সঁদেস।
সুর-নর-মুনি ঔর পীর ঔলিয়া, দেবী-দেব-গনেস।
ধরি ধরি জনম সবৈ ভরমে হৈঁ, ব্রহ্মা-বিস্নু-মহেস।
জোগী জংগম ঔর সন্ন্যাসী, দীগম্বর দরবেস।
চুণ্ডিত-মুণ্ডিত-পণ্ডিত লোঈ, সুর্গ রসাতল সেস।
জ্ঞানী গুণী চতুর ঔ কবিনা, রাজা রংক-নরেস।
কোই রহীম কোই রাম বখানৈ, কোঈ কহৈ আদেস।
নানা ভেষ বনায় সবৈ মিলি, ঢুঁঢ়ি কিরে চহুঁ দেস।
কহেঁ কবীর অন্ত না পৈহো, বিন সতগুরু উপদেস।'

অর্থাৎ, এই দেশটা এমনি যে, এখানে আর ফিরতে হবে না। যারা যারা গেছে তারা কেউই ফিরে আসে নি বা কোনো খবরও পাঠায় নি। দেবতা, মানুষ, মুনি, পীর, আকলিয়া, নানা দেবদেবী, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই জন্ম নিয়ে নিয়ে ঘুরে মরে। যোগী, জংগম, সন্ন্যাসী, দিগম্বর, দরবেশ, টিকিধারী সাধু, নেড়ামাথা সাধু এদের গতি—হয় স্বর্গে, না হয় রসাতলে। জ্ঞানী, গুণী, চতুর, ছোট লোক, রাজা, ভিখারী কত রকমেরই না লোক আছে।

এরা কেউ রহিমের গুণগান করে কেউ বা রামের। আবার কেউ কেউ 'আদেশ' 'আদেশ' বলে। এরা সবাই মিলে নানা বেশ ধরে চারদিকে খুঁজে খুঁজে ফেরে। কবীর বলছে, সদ্‌গুরুর উপদেশ ছাড়া কেউ অন্ত পেতে পারে না।

এই ভবসংসার কণ্টকাকীর্ণ। এখানে মানুষেরা দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। কবীর বলছেন, সৎগুরুর নামই একমাত্র গতি। সৎগুরুর নাম নিলে এই কণ্টকাকীর্ণ ভবসংসার হতে উদ্ধার পায় মানুষ। তাই কবীর বলেছেন,—

'রহনা নহিঁ দেস বিরানা হৈ।
যহ সংসার কাগজকী পুড়িয়া, বুঁদ পড়ে ধূল জানা হৈ।
যহ সংসার কাঁটকী বাড়ী, উলঝ-পুলঝ মরি জানা হৈ।
যহ সংসার ঝাড় ঔ ঝাঁখর, আগ লগে বরি জানা হৈ।
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো, সতগুরু নাম ঠিকানা হৈ।'

অর্থাৎ, এখানে থাকতে হবে না। এদেশ মরুভূমি (এদেশ অন্যের)। এ সংসার কাগজের পুরিয়া, একটু একটু করে ধূলিতে মিশে যাবে। সংসার কণ্টকাকীর্ণ। এখানে জড়িয়ে পড়ে মরতে হবে। এ সংসার কাঁটার ঝাড়। আগুন লেগে পুড়ে যাবে। কবীর বলছে, ভাই সাধু, শোন, সদ্‌গুরুর নামই একমাত্র গতি।

সংসারে থাকতে হলে মানুষ নানা রকম দুঃখ পায়। সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিলে সে ভবসংসারের সকল দুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভ করে। কবীর এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—

'পীলে প্যালা হো মত্‌বালা, প্যালা নাম অমীরসকা রে।
বালপনা সব খেলি গঁবায়া, তরুন ভয়া নারী বসকা রে।
বিরধ ভয়া কফা—বায়নে ঘেরা, খাট পড়া ন জায় খসকা রে।
নাভি কঁ বল বিচ হৈ কস্তূরী, জৈসে মিরগ ফিরে বনকা রে।
বিন সতগুরু ইতনা দুখ পায়া, বৈদ মিলা নহি ইস তন্‌কা রে।

মাত পিতা বন্ধু সুত তিরিয়া, সঙ্গ নহি কোই জায় সকা রে।
জব লগ জীবৈ গুরু গুন লেগা, ধন জোবন হৈ দিন দসকা রে।
চৌরাসী জো উবরা চাহে ছোড় কামিনাকা চসকা রে।
কহৈ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, নখ-সিখ পূর রহা বিসকা রে।'

অর্থাৎ, ওরে মাতাল, পেয়ালা ভরে নামের অমৃত রস পান করে নে। সমস্ত ছেলেবেলাটা খেলা করে কাটিয়ে দিলি। তারপরে যখন তরুণ হলি তখন হলি নারীর বশ। তারপরে হলি বৃদ্ধ। বাতে আর কফে ধরলো, বিছানা নিলি। এখন আর একটু নড়তে-চড়তেও পারিস না।

নাভিকমলের মধ্যে রয়েছে কস্তুরী। তার গন্ধ পেয়ে বনে বনে মৃগেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সদ্‌গুরু পাওনি বলে এত দুঃখ পেলে। তোমার এই দেহের বৈদ্য পেলে না। মাতাপিতা বন্ধু স্ত্রীপুত্র কেউ তো তোমার সঙ্গে যেতে পারবে না। যতদিন বাঁচবে আশ্রয় নেবে গুরুর। ধন যৌবন দিন দশেকের বৈতো নয়। চুরাশী যোনি ভ্রমণ থেকে যদি উদ্ধার পেতে চাও তবে ব্যর্থ কামনার ব্যথা পরিত্যাগ করো। কবীর বলছেন, ভাই শোন, তোমার নখ থেকে চুল অবধি বিষে ভরা।

সদ্‌গুরুর কৃপাতেই শিষ্যের সিদ্ধিলাভ হয়। তিনি প্রেমের পেয়ালা ভরে ভরে খান ও শিশুকে খাওয়ান। তিনি ব্রহ্মদর্শন করান। কবীর বলেছেন,—

'সাধো, সো সতগুরু মোহি ভাবৈ।
সত্ত প্রেমকা ভর ভর প্যালা আপ পিবৈ মোহি প্যাবৈ।
পরদা দূর করৈ আঁখিনকা, ব্রহ্ম-দরস দিখলাবৈ।
জিস দরসমেঁ সব লোক দরসৈ, অনহদ সব্দ সুনাবৈ।
একহি সব সুখ-দুখ দিখলাবৈ, সব্দমেঁ সুরত সমাবৈ।
কহৈঁ কবীর তাকো ভয় নাহীঁ, নির্ভর পদ পরসাবৈ।'

অর্থাৎ, সাধু, সেই সৎগুরুকে আমার ভাল লাগে; যিনি সাচ্চা

প্রেমের পেয়ালা ভরে ভরে নিজে খান আর আমাকেও খাওয়ান। যিনি চোখের পরদা ঘুচিয়ে দেন, ব্রহ্মদর্শন করান, যাঁর (ব্রহ্মের) দর্শনে সমস্ত লোক-লোকান্তর দৃষ্ট হয়। অনাহত শব্দ শ্রুত হয়। একমাত্র সেই সদ্গুরুই দেখিয়ে দেন সুখদুঃখের রহস্য। শব্দের (ব্রহ্মের) মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন অন্তর্মুখী বৃত্তিকে। কবীর বলেছেন, তাঁর কোন ভয় নেই। তিনি নির্ভয় পদ স্পর্শ করিয়ে দেন।

সদ্গুরুর কৃপা না হলে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের মিলন সম্ভব হয় না। সেই কারণে ভক্ত কবীর বলেছেন,—

'পিয়া মেরা জাগে মৈঁ কৈসে সোঈ রী।
পাঁচ সখী মেরে সঙ্গকী সহেলী,
উন রঙ্গ রঙ্গী পিয়া রঙ্গ ন মিলী রী।
সাস সয়ানী ননদ-দ্যোরানী,
উন ডর ডরী পিয় সার ন জানী রী।
দ্বাদস উপর সেজ বিছানী,
চঢ় ন সকৌ মারী লাজ লজানী রী।
রাত দিবস মোহিঁ কূকা মারে,
মৈঁ ন সুনী রচি নহি সঙ্গ জানী রী।
কহৈঁ কবীর সুনু সখী সয়ানী,
বিন সতগুরু পিয়া মিলে ন মিলানী রী॥'

অর্থাৎ, প্রিয় আমার জেগে রয়েছেন। আমি কীভাবে ঘুমিয়ে পড়লুম। পাঁচজন সখী আমার সঙ্গিনী। তাদের রঙ্গেই আমার রঙ্গ লেগেছে। প্রিয়তমের রঙ্গ তো লাগে নি। আমার স্যায়না শাশুড়ী, ননদ ও জা এদের ভয়ে আমি প্রিয়তমের মর্ম জানতে পারি না। দ্বাদশের ওপর আমার শয্যা বিছানো রয়েছে। তার ওপ্পর আমি উঠতে পারি না। সেই লজ্জায় মরে যাই। দিনরাত আমার বুকে ব্যথা (বিরহের) বাজে, কিন্তু আমি না পেলুম তাঁর (প্রিয়ের)

কথা শুন্‌তে, না জানতে পারলুম তাঁর সঙ্গসুখ কেমন। কবীর বলছেন, ওগো আমার স্যায়না সখি, শোন কথা, সদ্‌গুরু ছাড়া প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হয় না।

কবীরের জীবনে ঠিক এমনটি ঘটেছিল। তিনিও প্রিয় সখীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন প্রিয়তম নায়ক অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্যে। কিন্তু সেই দিব্য মিলনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছিল গুরুবিনা। গুরুর অভাব যখন বুঝতে পারলেন কবীর, তখুনি তিনি গুরু অন্বেষণে চারদিকে ছুটে বেড়ালেন। বহু সাধু-সন্তদের সঙ্গ করলেন। অবশেষে পেলেন একজন মনের মতো গুরু। নেতি নেতি করে ব্রহ্মকে দর্শন করার মতো অনেক অনুসন্ধান করে কবীর পেলেন সদ্‌গুরু। সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ গুরু এসে কৃপা করলেন কবীরকে। নামমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে এগিয়ে দিলেন তাঁকে সাধনপথে। সেই গুরুদত্ত নামামৃত পান করে কবীর পেলেন সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরকে। পরবর্তী জীবনে তিনি আচার্যের ভূমিকা নিয়ে সংসারাসক্ত জীবকে মুক্তিসাধনায় বসবার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছেন।

গুরুকৃপা প্রসঙ্গে কবীর বলেছেন,—

'গুরু মোহি ঘুঁটিয়া অজর পিয়াঈ।
জবসে গুরু মোহি ঘুঁটিয়া পিয়াঈ, ভঈ সুচিত
মেটী ছুচি-তাঈ।
নাম-ঔষধী অধর-কটোরী, পিয়ত অঘায় কুমতি গঈ মোরী।
ব্রহ্মা-বিস্নু পিয়ে নহিঁ পায়ে, খোজত সম্ভু জন্ম গঁবায়ে।
সুরত নিরত করি গিয়ৈ জো কোঈ, কহৈঁ কবীর অমর
হোয় সোঈ॥'

অর্থাৎ, গুরু আমাকে খাইয়ে দিয়েছেন অজর সিদ্ধি ঘোটা। যেদিন থেকে গুরু আমাকে সিদ্ধি ঘোটা খাইয়েছেন, সেদিন থেকে আমার চিত্ত স্থির হয়ে গেছে। আমার সকল দোটানার ভাব দূর

হয়ে গেছে। অধর কটোরায় নাম-ঔষধ খেয়ে আমার কুমতি তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে। এটি ব্রহ্মা বিষ্ণু খেতে পান নি; শম্ভু এর খোঁজে জন্ম কাটালেন। কবীর বলছে, সুরতি ধ্যানে বসে এ যে খেতে পারে, সেই হয় অমর।

গুরুকৃপায় কবীরদাস লাভ করেছিলেন আর এক সুন্দর জীবন—যেখানে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু এ-সব আদৌ নেই। আছে অনন্ত সুখ—অনাবিল শান্তি। গুরুপ্রসাদ আর সাধুসঙ্গ এই দুটি ছিল কবীরদাসের জীবনে পরম সুহৃদ এবং সহায়। তিনি সর্বদা এই নিয়ে গর্ব করতেন। বলতেন, এই নিয়ে আমি বিশ্বজয় করবো।

তাঁর সেই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন সফল হয়েছে। আজও কবীরের দোঁহা দেশবিদেশের জনমানসের কাছে পরম শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রেম-ভক্তি না থাকলে গুরুকৃপা মেলে না। আর সকলের অন্তরে প্রেম-ভক্তির প্রকাশ ঘটে না, যদি-না তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। প্রেম-প্রীতির বিষয় ভক্তি। মানুষ জন্মান্তরে কর্মফল অনুসারে একে লাভ করতে পারে। কবীরের পূর্ব জন্মের কর্ম ভালো ছিলো। তার ফলে তিনি এই জন্মে লাভ করেছেন অহেতুকী ভক্তি। এই অমূল্য ধনের বিনিময়ে ঈশ্বরের করুণা পাওয়া যায়। কবীর বলেছেন,—

> 'হদ্দ ছাঁড়ি বেহদ গয়া, কিয়া সুন্নি অসমান।
> মুনিজন মহল ন পাবঈ, তহাঁ কিয়া বিশ্রাম॥
> দেখৌ কর্ম কবীরকা, কছু পূরব-জনমকা লেখ।
> জাকা মহল ন মুনি লহৈঁ, সো দোসত কিয়া অলেখ॥'

অর্থাৎ, সীমা ছেড়ে অসীমেতে পৌঁছলুম। শূন্যেতে স্নান করলুম। মুনিরা যেখানে জায়গা পান না, সেখানে বিশ্রাম করলুম। কবীরের কর্মটি দেখ। এ আর কিছু নয়, জন্মান্তরের ললাটলিপি। যাঁর ধাম মুনিরও অগম্য, সেই অলখ পুরুষকে বন্ধুরূপে পেলেন।

বাস্তবিক বিশুদ্ধ প্রেমের গুণে ভক্তিলাভ হয়। আর সেই ভক্তি দুর্লভ ধন। মুনিঋষিরা যুগযুগান্তর ধরে তপস্যা করে তাকে লাভ করতে পারে না। যে ঈশ্বরপ্রেমিক তার পক্ষেই অহেতুকী ভক্তি-লাভ সম্ভব। তবে সঙ্গে প্রয়োজন জন্মান্তরের ললাটলিপি—যেমন ছিল দ্বাপরে অর্জুনের। ভাগ্যবলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করতে সমর্থ হন। যে রূপ মুনিঋষিদের তপস্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অর্জুন তা একান্ত ভক্তিবলে লাভ করলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জুনকে বলেছেন,—

'নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্যঃ এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥'

অর্থাৎ, (হে অর্জুন) তুমি আমার যে রূপ দর্শন করেছ সেই রূপ বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান বা যজ্ঞের দ্বারা দেখা সম্ভব নয়।

হে অর্জুন! অনন্য ভক্তিদ্বারা আমি এইভাবে অনুভূত হতে পারি। হে পরন্তপ! এভাবে আমি জ্ঞাত হতে পারি আর এভাবে তার দ্বারা প্রবিষ্ট হতে পারি।

আবার কেবল ভক্তি লাভ করলেই হবে না। তাকে চিরস্থায়ী করার জন্যে প্রয়োজন হয় সদ্‌গুরুর কৃপা। ভক্ত কবীর বলেছেন,—

'(জাকে) বারহ্‌মাস বসন্ত হোয়, (তাকে) পরমারথ বুঝৈ
বিরলা কোয়।
বরিসৈ অগিনি অখণ্ড ধার, হরিয়র ভৌ-বন (অ) ঠারহ ভার
পনিয়া আদর ধরী ন লোয়, পবন গহৈ কস মলিন ধোয়।
বিনু তরিবর ফুলৈ আকাস, সিব-বিরঞ্চি তহঁ লেহি বাস।
সনকাদিক ভূলে ভঁবর বোয়, লখ -চৌরাসী জোইনি জোয়।
জো তোহি সতগুরু সত্ত লখাব, তাতে ন ছুটে চরণ ভাব।
অমর লোক ফল লাবৈ চাব, কহঁহি কবীর বুঝৈ সো পাব।'

অর্থাৎ, যেখানে বার মাসই বসন্ত সেই পরমার্থ পদ বুঝতে পারে এমন লোক বিরল। অনন্তধারে অগ্নিতেজ বর্ষিত হচ্ছে তবু বন সম্পূর্ণ সবুজ হয়ে আছে। লোকে যদি জলের (ভক্তির) যত্ন না করে, তাহলে বাতাসেই (প্রাণায়াম) ময়লা দূর হয়ে যাবে। সেখানে গাছ নেই, তবু আকাশ ফুলে ভরে থাকে। শিব আর ব্রহ্মা সেই ফুলের গন্ধ উপভোগ করেন। সনকাদি মুনি ভ্রমর হয়ে ভুলে রয়েছেন আর চুরাশী লক্ষ যোনিকে দেখছেন। সদ্গুরু তোমাকে যে সত্য দেখাবেন তাতে করেই ভগবদ্চরণে তোমার ভক্তি অটুট থাকবে। এমনি যে করতে পারে সে অমরলোকে চতুর্বর্গ ফল লাভ করে। কবীর বলছে, যে বোঝে সেই পায়।

॥ বারো ॥

পরম ভাগবতের জীবনে সর্বপ্রথম যে স্তরের প্রকাশ ঘটে তাকে কেউ বলে প্রেমাঙ্কুর, কেউ বলে ভাব, আবার কেউ কেউ বলে রতি। রতির পরবর্তী স্তরকে বলে প্রেম। প্রেম গাঢ় বা ঘনীভূত হলেই স্নেহে পরিণত হয়। স্নেহ থেকে আসে মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। মহাভাব হচ্ছে সাধকের সর্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থা। সেই সময় জীব হয় শিব—মিশে যায় আনন্দময় ব্রহ্মে। সেই ভাবের সীমানায় পৌঁছতে হলে বীরত্ব নিয়ে সাধনভজন করতে হয়। গুরুনির্দিষ্ট পথ ধরে এগুতে হয়। ভক্ত কবীর সেইমতো চলেছেন। তাঁর প্রেমসাধনা কঠিন। তবু তিনি সাহস করে সেই পথ ধরে চলেছেন।

ঈশ্বর প্রেমময়—তিনি লীলাময়। ভক্তকে নিয়ে লীলা করছেন। তাঁর লীলার অন্যতম উপকরণ হচ্ছে প্রেম। এই প্রেমের টানে

তিনি কখনো ভক্তের কাছে আসছেন আবার কখনো ভক্তকে টেনে নিচ্ছেন নিজের সুরভিত অঙ্কে। প্রেমিকা বধূর বেশে ভক্ত চলেছে অভিসারে প্রেমিক পতির সঙ্গে মিলতে। এই মিলনের পথে অনেকরকম বাধা আসবে সত্য। তবু সেই বাধা অতিক্রম করতে হবে প্রেমের শক্তি দিয়ে। কান্না হচ্ছে এই পথের আলো। দুঃখ হচ্ছে যষ্ঠি। সুতরাং এই দুটোর জন্যে অকারণ ভাবলে চলবে না। যেমন করে হোক সংগ্রামের দ্বারা এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যের দিকে।

অভিসারিকা চলেছে। কবীর বলছেন,—

'ভীজৈ চুনরিয়া প্রেম-রস বুঁদন।
আরত সাজকে চলী হৈ সুহাগিন পিয় অপনেকো ঢূঁঢ়ন।
কাহেকী তোরী বনী হৈ চুনারিয়া কাহেকে লগে
চারোঁ ফুঁদন।
পাঁচ তত্তকী বনী হৈ চুনরিয়া নামকে লাগে ফুঁদন।
চঢ়িগে মহল খুল গঈ রে কিবরিয়া দাস কবীর লাগে
ঝুলন॥'

অর্থাৎ, বিন্দু বিন্দু প্রেমরসে ভিজে গেছে চুনরী (বুঁটিদার ওড়না), আপন প্রিয়তমের খোঁজে সোহাগী চলেছে ব্যাকুল হয়ে। ওগো, তোর চুনরিয়া কি দিয়ে তৈরি? তার চারদিকে কিসের ঝালর ঝুলছে? পঞ্চতত্ত্বের তৈরি চুনরিয়া আর তাতে ঝুলছে নামের ঝালর। ওরে প্রিয়তমের মহলে উঠে যা। দরজা খুলে গেছে। কবীরদাস তাই দেখে আনন্দে দোল খাচ্ছে।

কিন্তু প্রেমিকা কেবল আসে না প্রেমিকের কাছে। প্রেমিকও যান প্রেমিকার কাছে। প্রেমিকা বধূ বাপের বাড়িতে চলে গেছে। সেখানে থাকতে তার ভালো লাগছে না। শ্বশুরবাড়িতে আসবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় বসে আছে সেজেগুজে। ভাবছে, কখন স্বামী আসবে তাকে নিতে। তেমনি

প্রেমিকা বধূর মতো ভক্তও অপেক্ষা করবে পতিরূপ ঈশ্বরের জন্যে। ঈশ্বর যেমন ভক্তের প্রেমের জন্যে কাঙাল, তেমনি ভক্তও পাগল হয় ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করার অজুহাতে।

কবার বলেছেন,—

'নৈহরসে জিয়রা কাট রে।
নৈহর নগরী জিসকে বিগড়ী, উসকা ক্যা ঘর-বাট রে।
তনিক জিয়রবা মোর ন লাগৈ, তনমন বহুত উচাট রে।
যা নগরী মেঁ লখ দরবাজা, বীচ সমুন্দর ঘাট রে।
কৈসেকৈ পার উতরি হৈঁ সজনী, অগম পন্থকা পাট রে।
অজব তরহকা বনা তম্বূরা, তার লগৈ মন মাত রে।
খুঁটী টুটী তার বিলগানা, লোক ন পুছত বাত রে।
হঁস হঁস পূছৈ মাতুপিতাসোঁ, ভোরে সাসুর জাব রে।
জো চাহৈ সো বোহী করি হৈঁ, পত বাহীকে হাথ রে।
ন্হায়-ধেয়ে দুলিহন হোয় বৈঠী, জোহৈ পিয়কী বাট রে।
তনিক ঘুংঘটরা দিখাব সখীরী, আজ সোহাগ কী রাত রে।
কহৈ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, পিয়া-মিলনকী আস রে।
ভোর হোত বন্দে য়াদ করোগে, নঁীদ ন আরে খাট রে।'

অর্থাৎ, আমার মন বাপের বাড়ি থেকে উঠে গেলো। যার বাপের বাড়িতে সুখ নেই, কী হবে তার ঘরদোর দিয়ে। এখানে আমার একটুও মন লাগছে না। শরীর ও মন বড়ই উচাটন হয়েছে। এই আমার বাপের বাড়ির শহরে লাখ দরজা আর মাঝখানে সমুদ্রের ঘাট। সখিরে, আমি কীভাবে পরপারে যাব? বিস্তার যে অপার। আমার বাপের বাড়িতে তৈরী করেছিল আজব তানপুরা। তার তারের ঝঙ্কারেই মন উঠতো মেতে। এখন সে তানপুরার খুঁটি ভেঙ্গে গেছে। তার গেছে আলগা হয়ে। অথচ তার জন্যে কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করে না। আমার মা-বাবাকে হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করলুম, কাল ভোরে কী শ্বশুরবাড়ী যাব? (ওঁরা কিছুই

বললেন না) এখন ওঁর যা ইচ্ছে তাই হবে। ওঁরই হাতে আমার লজ্জাসরম। স্নানটান করে কনে হয়ে বসে আছি প্রিয়ের পথ চেয়ে। সখিরে, একটু ঘোমটা খুলে দেখতে দে আমায়, আজ আমার মিলনের রাত যে। কবীর বলছে, ভাই সাধু, শোন, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশাতেই আমার যা-কিছু সব। ওরে বান্দা (ভৃত্য), শোন, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা (শ্বশুর বাড়ি যাবার কথা) মনে করিয়ে দিবি। তাছাড়া আজ তো বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছে না।

প্রিয়ার প্রতীক্ষার আর শেষ নেই। অনেকরাত পর্যন্ত জেগে থাকার পর ঘুম নামে চোখে। তখন সে নিদ্রা যায়। এই নিদ্রাই হচ্ছে শুভলক্ষণ। কারণ প্রিয়তম আসেন ঠিক সেই মুহূর্তে। তিনি এসে জাগিয়ে দেন। কবীর বলেছেন,—

'সুতল রহলূ মৈঁ নীঁদ ভরি হো, পিয়া দিহলৈঁ জগায়।
চরণ-কঁবলকে অঞ্জন লো নৈনা লে লূঁ লগায়া॥
জাসোঁ নিঁদিয়া ন আবৈ হো নহি তন অলসায়।
পিয়াকে বচন প্রেম-সাগর হো, চলূঁ চলী হো নহায়॥
জনম জনমকে পাপবা ছিনমে ডারব ধোবায়।
যহি তনকে জগ দীপ কিয়ৌ প্রীত বতিয়া লগায়॥
পাঁচ তত্তকে তেল চুআ এ ব্রহ্ম অগিনি জগায়।
প্রেম-পিয়ালা পিয়াইকে হো পিয়া পিয়া বৌরায়॥
বিরহ অগিনি তনতলফৈ হো জিয় কছু ন সোহায়॥
উঁচ অটরিয়া চঢ়ি বৈঠ লূ হো জহঁ কাল ন জায়।
কহৈঁ কবীর বিচারিকে হো জম দেখ ডরায়॥'

অর্থাৎ, আমি ঘুমে অচেতন হয়ে শুয়েছিলুম। প্রিয়তম আমাকে জাগিয়ে দিলেন। আমার চোখে লাগিয়েছি তাঁর চরণকমলের অঞ্জন। যাতে আর ঘুম না আসে, আলস্য না লাগে শরীরে তাই করবো। প্রিয়তমের কথা যে প্রেমের সমুদ্র। তাতে আমি স্নান

করতে যাই। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ এক মুহূর্তে ধুয়ে ফেলবো। এই শরীরকে করবো জগতের দীপ। তাতে দেবো প্রীতির সলতে। আর পঞ্চতত্ত্বের তেল দিয়ে ব্রহ্ম-অগ্নিতে জ্বালিয়ে নেবো। আমাকে পেয়ালা ভরে প্রেমসুধা পান করিয়ে প্রিয়তমও মত্ত হয়ে তা পান করে নিলেন। বিরহ আগুনে দেহ জ্বলে পুড়ে গেলো, আর কিছুই ভালো লাগে না। আমি সেই উঁচু অট্টালিকার ওপর চড়ে বসেছি। সেখানে কালের গতি নেই। কবীর বিচার করে বলছে, সেখানে আমাকে দেখে যমও ভয় পায়।

বধূর এখন বাপের বাড়িতে থাকতে ভালো লাগছে না। দেহ আছে কিন্তু মন নেই। মন ঘুরছে প্রিয়তমের অন্বেষণে। কবীর বলেছেন,—

'অব মোহি লে চলু্ ননদকে বীর অপনে দেসা।
ইন পঞ্চন মিলি লূটী হূঁ, সঙ্গ-সঙ্গ আহি বিদেসা।
গঙ্গতীর মোরী খেতী-বারী, জমুনতীর খরিহানা।
সাতোঁ বিরবী মেরে নীপজৈ, পাঞ্চূ মোর কিসানা।
কহৈ কবীর য়হ অকথ কথা হৈ, কহতাঁ কহী ন জাঈ।
সহজ ভাই জিহি উপজৈ, তে রমি রহৈ সমাঈ।'

অর্থাৎ, ও আমার ননদের ভাই, এবার আমাকে তোমার আপন দেশে নিয়ে চলো। এই পাঁচটিতে (পঞ্চেন্দ্রিয়) মিলে সব লুটে নিলো। এরা বিদেশে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। গঙ্গাতীরে (গঙ্গা-ইড়া) আমার কৃষিক্ষেত, যমুনাতীরে (পিঙ্গলা) আমার খামার বাড়ি। আমার ক্ষেতে উৎপন্ন হয়েছে সাতটি বীজ (সপ্ত ধাতু, যথা—চর্ম, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং বীর্য)। আমার কিষাণ পাঁচটি। কবীর বলছে, এ কথা অকথনীয়, এ কাউকে বলা যায় না। যাদের মধ্যে সহজ বোধ জন্মে, তারাই গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকে।

ননদের ভাই রাজী হলেন। তখন বধূর মনে আর আনন্দ ধরে

না। বাপের বাড়িতে থাকার সময় যারা নানারকম নিন্দে করতো, এবার তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো বধূ,—আমি এবার শ্বশুর বাড়ি যাবো। ওরা শুনে বললে, কার সঙ্গে? বধূ বললে, স্বামীর সঙ্গে।

কবীর বলেছেন,—

'মৈ অপনে সাহব সঙ্গ চলী।
হাথমেঁ নরিয়ল মুখমেঁ বীড়া, মোতিয়ন মাঁগ ভরী।
লিল্লী ঘোড়ী জরদ বছেড়ী, তাপৈ চঢ়িকে চলী
নদী কিনারে সতগুর ভেঁটে, তুরত জনম সুধরী।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, দোউ কুল তারি চলী॥'

অর্থাৎ, আমি চলবো আমার নিজের প্রভুর সঙ্গে। হাতে নেবো নারকেল, মুখে দেবো পানের খিলি। সীথিঁ ভরে পরবো মোতি। নীল ঘোড়ীর হলদে রঙের বাচ্চা। তার পিঠে চড়ে যাবো। নদীর ধারে সদ্‌গুরুর দর্শন মিলবে। অবিলম্বে আমার জন্মের সংস্কার হয়ে যাবে। কবীর বলছে, সাধুরে ভাই, শোন, আমি দুই কুল উদ্ধার করে চললুম।

বধূ শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছে। তার মনে উদয় হয়েছে নানারকম ভাব! কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো বা গুণগুণ সুরে গান গায়। সে এক অদ্ভুত অবস্থা! বধূর ওরকম ভাব দেখে বিজ্ঞজনেরা বললেন,—

'দুলহিনি তোহি পিয়কে ঘর জানা।
কাহে রোবো কাহে গাবো কাহে করত বহানা॥
কাহে পহিরো হরি হরি চুরিয়াঁ পহিরো প্রেমকৈ বানা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, বিন পিয়া নাহি ঠিকানা॥'

অর্থাৎ, ওগো কনে, তোমাকে স্বামীর ঘরে যেতেই হবে। তবে কেন কান্নাকাটি করো? গান গাও কেন? কেনই বা বায়না করো। সবুজ সবুজ চুড়ি পরেছো কেন, প্রেমের পোশাক পরো। কবীর

বলছে, ভাইরে সাধু, শোন, প্রিয়তম ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

সত্যিই তো ঈশ্বরই সব। জীবকে যেমন করে হোক তাঁর কাছে পৌঁছুতে হবে, সে আজ হোক আর কাল হোক না কেন। ঈশ্বর ছাড়া জীবের কোন গতি নেই। তিনিই হচ্ছেন জীবের গতি-নিয়ন্ত্রক। কবীর সেই ঈশ্বরকে পেয়েছেন। তাঁকে পাবার উপায় বলে দিয়েছেন।

বাপের বাড়ির পোশাক পরে বধূ এসেছে শ্বশুরালয়ে। সেই পোশাকে লেগেছে দাগ। তাছাড়া তার মনটাও রয়েছে দোটানায়। একবার বাপের বাড়ির দিকে মন আর একবার শ্বশুরবাড়িতে। তার কখনো আপসোস হচ্ছে, হয়তো বা শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঠিক করে ভালো করে নি। তার হাবভাব বুঝতে পেরে হিতৈষীরা বলছে— 'ওগো নতুন বৌ, তুমি কাঁচুলি ধোওনি কেন? তোমার ছেলে-বেলার ময়লা কাঁচুলি। তাতে দাগ লেগেছে। না ধুলে প্রিয়তম তোমার খুশি হবেন না আর তোমাকে বিছানা থেকে নীচে ফেলে দেবেন।'

তারপর বলছে, 'ওগো বৌ, দোটানার ভাবটা ঘুচিয়ে ফেলো, মনের ময়লা ধুয়ে ফেলো। এখন শ্বশুর-বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। স্বামী দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এখন আর পিছিয়ে কী হবে!'

শ্বশুরবাড়ি যাবার দিন এসে গেছে। স্বামী আগে চলে গেছেন। বধূ এখন খুব খুশি। নির্জন বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সে পথে জানাশুনো কেউ নেই। কাহারেরা চলেছে ডুলি নিয়ে। বধূর মন কেমন করতে লাগলো আপনার লোকজনদের জন্যে। সে বললে,—

'আয়ৌ দিন গৌনেকৈ হো, মন হোত হুলাস।
ডোলিয়া উটাবে বীজা বনবাঁ হো, জহঁ কোঈ ন হমার॥
পইয়ঁা তেরী লাগৌঁ কহরবা হো, ডোলি ধর ছিল বার।
মিল লেবৈঁ সখিয়া সহেলর হো, মিলেঁা কুল পরিবার॥

দাস কবীর গাবৈঁ নিরগুণ হো, সাধো করি লে বিচার।
নরম-গরম সৌদা করি কে হো, আগে হাট না বাজার॥'

অর্থাৎ, স্বামীর কাছে (শ্বশুরবাড়ি) যাবার দিন এলো। উল্লসিত হয়ে উঠলো মন। যেখানে আমার পরিচিত কেউ নেই তেমনিধারা নির্জন বনের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমার ডুলি। ওরে কাহার (বেহারা), তোদের পায়ে পড়ি, একটু দেখা করে নি। দেখা করে নি আমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে। কবীরদাস গাইছে, ওরে সাধু, বিচার করে দেখ স্বামীটি নির্গুণ। কাজেই, ভালোমন্দ (নরম-গরম) সওদা যা করবার এই বেলা করে নে। সামনে কিন্তু হাট-বাজার কিছুই নেই।

বধূ যাচ্ছে স্বামীর কাছে। সে জায়গাটির পরিচয় দিয়ে বলছে,—

'শাঁঈ মোর বসত অগম পুরবা জহঁ গমন হমার।
আট কুঁআ নব বাবড়ী সোরহ হৈঁ পনিহার।
মহল (ভরল) ঘয়লরা ঢরকি গয়ল রে ধন ঠাড়ী মনমার॥
ছোট মোট ডঁড়িয়া চন্দনকৈ হো, ছোট চার কহার॥
জায় উতরি হৈঁ বাহী দেসবাঁ হো, জহাঁ কোই না হমার।
উঁচী মহলিয়া সাহেবকৈ হো, লগী বিথমী বজার॥
পাপ-পুন্ন দোউ বনিয়া হো, হীরালাল অপার।
কহ কবীর সুন সাইয়াঁ মোর যাঁহিয় দেস।
জো গয়ে সো বহুরে না কো কহত সন্দেস॥'

অর্থাৎ, আমার প্রভু রয়েছেন অগম্য পুরীতে। সেখানেই আমি যাবে। সেখানে আছে আটটি কুঁয়ো আর নটি বাপী, আর আছে ষোল জন মেয়ে। তারা জল আনে। ভরা কলসীর জল ছলকে পড়ে গেলো। বধূ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চন্দনের একটি ছোটখাটো ডুলি তার ছোট চারটি বাহক। যেখানে আমার কেউ নেই সেখানে আমাকে নাবিয়ে দেয়। আমার প্রভুর উঁচু মহল

তার সঙ্গে আছে এক ভীষণ বাজার। সেখানে আছে পাপ আর পুণ্য এই দুই বোন। আর আছে অসংখ্য হীরামোতি। কবীর বলছেন, শোন বন্ধু, এইটিই আমার দেশ। সেখানে যে যায়, সে আর ফেরে না। সেখানকার খবর বলবে কে?

ভক্তের অন্তরে থাকেন ভগবান। কবীর বলেছেন, ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে অন্তরের দিকে মুখ ফেরাও। এখানেই রয়েছেন রাম এবং রহিম, কৃষ্ণ আর করিম। তিনি বলেছেন,

'জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ ঔর মূল্লুক কেহি কেরা।
তীরথ-মূরত রাম-নিবাসী বাহর করে কো হেরা।
পূরব দিসা হরিকৌ বাসা পচ্ছিম অলহ মুকামা।
দিলমেঁ খোজ দিলহিমেঁ খোজ ইহৈঁ করীমা-রামা।
জেতে ঔরত-মরদ উপানী সো সব রূপ তুম্‌হারা।
কবীর পোঁগডা অলহ-রামকা সো গুরু পীর হমারা।'

অর্থাৎ, যদি খোদা থাকেন মসজিদে তবে বাকী জগৎটা কার? তীর্থ-মূর্তি সব রামের মধ্যেই রয়েছে। বাইরে কে খুঁজে মরে। পূব দিকে হরির বাস আর পশ্চিমে নাকি আল্লার মোকাম। অন্তরে খোঁজ, কেবলমাত্র অন্তরেই খোঁজ। এখানে আছেন করিম, এখানেই আছেন রাম। হে রাম, যত নরনারী সব তোমারই রূপ। কবীর আল্লা-রামের ছেলে। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।

'বৈকুণ্ঠ কোথায় সৎসাহেব? কে একজন প্রশ্ন করলো কবীরকে। কবীরকে লোকে 'সৎসাহেব' নামে সম্বোধন করতো।

কবীর বললেন, সাধুসঙ্গই প্রকৃত বৈকুণ্ঠ। তোমরা উর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়ে কোথায় খুঁজছো বৈকুণ্ঠ?

'চলন চলন সবকোই কহত হৈ,
না জানৌ বৈকুণ্ঠ কহাঁ হৈ।
ভোজন এক প্রমিতি নহি জানৈঁ,
বাতনি হী বৈকুণ্ঠ বখানৈঁ॥

জ লগ হৈ বৈকুণ্ঠকী আসা,
তব লগ নহিঁ হরি-চরণ-নিবাসা॥
কহেঁ সুনে কৈসেঁ পতি অইয়ে,
জব লগ তহঁা আপ নহিঁ জইয়ে॥
কহৈ কবীর যহু কহিয়ে কাহি,
সাধ সঙ্গতি বৈকুণ্ঠহিঁ আহি॥'

অর্থাৎ, সবাই বলছে চল চল (বৈকুণ্ঠে চল)। কিন্তু বৈকুণ্ঠ কোথায় জানে না। এক যোজন পরিমাণ পথ চেনে না, আর বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে বলছে লম্বাচওড়া কথা। যতক্ষণ বৈকুণ্ঠের আশা থাকবে ততক্ষণ শ্রীহরির চরণে আশ্রয় মিলবে না। আর তাছাড়া নিজে যতক্ষণ সেখানে (বৈকুণ্ঠে) না গিয়েছ ততক্ষণ লোকের কথা শুনে তা বিশ্বাস করবে কী করে! কবীর বলছে, একথা কাকে বলবো যে, সাধুসঙ্গই বৈকুণ্ঠ!

এমনিভাবে অনেক কথা বলেছেন কবীর ভগবৎউপাসনা এবং তাঁকে লাভ করার প্রসঙ্গে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ঈশ্বর নিজে থেকে কৃপা না করলে ভক্তের অন্তরে সুউচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্ভব নয়।

'মেরী অঁখিয়াঁ জান সুজান ভঈ।
দেবর ননদ সুসর সঙ্গ তজি করি, হরি পীব তহাঁ গঈ॥
বালপনৈকে করম হমারে, কাটে জানি দঈ।
বাঁহ পকরি করি কিরপা কীন্হীঁ, আপ সমীপ লঈ॥
পানীকী বুঁদসে জিনি প্যঁড সাজ্যা, তা সঙ্গি অধিক রঈ।
দাস কবীর পল প্রেম ন ঘটঈ, দিন দিন প্রীতি নঈ॥'

অর্থাৎ, আমার চোখ স্যায়না হয়ে গেছে। আমার দেওর ননদ শ্বশুর এঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে যেখানে আছে, প্রিয়তম শ্রীহরি সেখানে চলে গেছে। আমার কাজ সব ছেলেমানুষি। ভাগ্যগুণে তার বাঁধন কেটে গেছে। দয়া করে তিনি আমার হাত ধরে নিজের কাছে

টেনে নিয়েছেন। জলের বিন্দু থেকে যিনি পিণ্ড (শরীর) সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে অধিক প্রীতি হলো। কবীরদাসের তাঁর প্রতি ক্ষণেকের জন্যেও প্রেম জন্মাল না। তবু তাঁর প্রীতি দিন দিন নব নব রূপে দেখা দিচ্ছে।

॥ তেরো ॥

'আমার বড় জলতৃষ্ণা লেগেছে। আমাকে একটু জল খেতে দেবে?' এক ব্রাহ্মণ যুবক বললে কমালীকে। কবীরপুত্রী কমালী কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে জল তুলছিলো। সে বেশ ডাগর মেয়ে। সারা দেহে যৌবন উপছে পড়ছিলো। যুবকের কথা শুনে সকাতর নয়নে একবার তাকিয়ে নিলে কমালী তার দিকে। তারপর কুয়ো থেকে পরিষ্কার জল তুলে নিয়ে দিতে লাগলো তার করপুটে।

যুবক সেই পবিত্র জল করপুট থেকে স্পর্শ করালো ওষ্ঠপুটে। আহা! বড় অমৃত সে জল। অসময়ে পরম বন্ধু। জলের অভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিলো। এবার মেয়েটির কৃপায় প্রাণে বাঁচলো যুবকটি।

তবে তার মন কিন্তু সুস্থির হলো না, হলো না শান্ত। শীতল জল পান করে তার তৃষ্ণা মিটলো, শরীর জুড়িয়ে গেলো; কিন্তু মন তো জুড়ালো না। সেখানে রয়েছে যে অতৃপ্তি-সংস্কারের খোঁচা। যুবকের একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করবে মেয়েটিকে, তার পরিচয় কী। কারণ সে ব্রাহ্মণ—গোঁড়া হিন্দু। যার-তার হাতের জল সে খায় না। আজ হঠাৎ একজন অপরিচিতার হাতের জল দায়ে পড়ে খেয়ে নিয়েছে। গা ঘিন ঘিন করছে তার। মেয়েটির মুখের

দিকে পুনরায় তাকালো যুবকটি। তার পূর্ণযৌবনের রূপ বড় ভালো লাগলো যুবকের। মেয়েটি যুবকের চাউনি দেখে লজ্জা পেলো। চোখ নামিয়ে নিয়ে তাকালো মাটির দিকে।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে, তোমার নাম কী?

কমালী বললে, আমার নাম কমালী।

—তোমার বাবার নাম কী?

—কবীর।

—তিনি কী করেন?

—তিনি তাঁত বোনেন। আমরা মুসলমান জোলা।

যেই একথা শুনলো যুবকটি কমালীর মুখ থেকে, অমনি গলায় আঙুল দিয়ে জল বমি করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলো। কমালীকে দু' একটা রূঢ় কথা শুনিয়ে বললে, কী বললি! এতক্ষণ বলিস নি কেন তোর পরিচয়? তাহলে কী আমি তোর হাতে জল খেতুম? তুই আমার জাত মারলি।

কমালী যুবককে কিছু বলতে যাবে এমনসময় সে হাত-পা নাড়তে নাড়তে মুখ বিকৃতি করে সেই স্থান ত্যাগ করলো। এলো কবীরের কাছে।

কবীর তখন কাকে ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণকে রাগে অগ্নিশর্মা অবস্থায় দেখে প্রশ্ন করলেন, আপনার মনে অতো রাগের কারণ কি, জানতে পারি কী?

যুবকের রাগ এমনি প্রবল হয়েছে যে, সে প্রথমে কোনো কথা বলতে পারলো না।

পরে একটু শান্ত হয়ে বললে, কী আর হবে, তোমার মেয়ে আমার জাত মেরে দিয়েছে। তোমার মেয়ের হাতে আমি জল খেয়েছি। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ আর তোমরা মুসলমান জোলা। একে ছোট জাত, তার ওপর বিধর্মী। রাম বলো, তোমাদের হাতে মানুষ জল খায়!

এই বলে যুবকটি কবীরের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলো তিনি কি বলবেন তা শোনবার জন্যে।

ক্রোধোন্মত্ত যুবকের কথা শুনে কবীর হাসলেন খানিকক্ষণ। তারপর যুবককে বললেন—

'পাঁড়ে বুঝি পিয় হু তুম পানী।
জিহি মিটিয়াকে ঘরমঁহ বৈঠে, তামঁহ সিষ্টি সমানী।
ছপন কোটি যাদব জহঁ ভীজে, মুনিজন সহস অঠাসী।
পৈগ পৈগ পৈগম্বর গাড়ে, সো সব সরি ভৌ মাঁটী।
তেহি মিটিয়াকে ভাঁড়ে পাঁড়ে, বুঝি পিয়হু তুম পানী॥
মচ্ছ-কচ্ছ-ঘরিয়ার বিয়ানে, রুধির-নীর জল ভরিয়া।
নদিয়া নীর নরক বহি আবৈ, পছু-মানুস সব সরিয়া॥
হাত ঝরী ঝরি গূদ গরী গরি, দূধ কহাঁতে আয়া।
সো লৈ পাঁড়ে জেবন বৈঠে, মটিয়হি ছুতি লগায়া॥
বেদ-কিতেব ছাঁড়ি দেউ পাঁড়ে, ঈ সব মনকে ভরমা।
কহহিঁ কবীর স্থনহু হো পাঁড়ে, ঈ তুম্হরে হৈ করমা॥'

অর্থাৎ, ওহে পাঁড়ে, বুঝেসুঝে জল খাও। যে-মাটির ঘরে বসে আছ, সেই মাটির দ্বারাই সব সৃষ্টি হয়েছে। এই মাটিতে ছাপান্ন কোটি যাদব গলে মিশে গেছে। অষ্টাশী হাজার মুনিও মিশেছে এই মাটিতে। এর প্রতি পদে কত পয়গম্বরকে গোর দেওয়া হয়েছে। সে সবই পচে মাটি হয়ে গেছে। ওহে পাঁড়ে, সেই যে মাটি তার ভাঁড়ে তুমি বুঝেসুঝে জল খাও। আবার জলে মাছ কচ্ছপ ঘড়িয়াল এসব বাচ্চা দিচ্ছে। তাদের রক্ত জলে মিশে যাচ্ছে। নদীর জল তো নরক বহন করে আনছে। কারণ তার মধ্যে পশু, মানুষ সব পচছে। হাত থেকে ঝরে ঝরে আর মাংস থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে দুধ হচ্ছে, তা কোথা থেকে আসছে জান কী? ওহে পাঁড়ে, তুমি সেই দুধ নিয়ে খেতে বসেছ আর এদিকে আবার মাটি নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার করছ। পাঁড়েজী, বেদ

কিতাব এসব ছেড়ে দাও। এ সমস্তই মনের ভুল। কবীর বলছে, ওহে পাঁড়ে, শোন, এ সবই তো তোমার কাজ।

কবীরের কথা শুনে যুবকটি অবাক হলো। ভাবলো, আমি তো একে মূর্খ মুসলমান বলে জানতুম। এ কীভাবে এতো তত্ত্ব-কথা বলছে!

কবীর বুঝতে পারলেন যুবকের মনোভাব। যুবককে কোন কথা বলতে না দিয়ে তিনি নিজেই বলতে আরম্ভ করলেন, বড় আশ্চর্য হচ্ছেন না? আমি ঠিক কথাই বলছি। আমি মূর্খ, কিবা আমার জ্ঞান। যা বলেছি সব গুরুকৃপায়। তাঁর কৃপায় এটুকু বলতে পারি যে, জাতবিচার মানুষের সৃষ্টি। মানুষ নিজেদের স্বার্থে এমন সংকীর্ণ জাল সৃষ্টি করেছে। আবার নিজেই এই জালে জড়িয়ে পড়েছে। বেরুবার পথ পাচ্ছে না। ঈশ্বর বা আল্লা প্রেমময়। তিনি চিরসুন্দর। তাঁকে লাভ করলে অন্তরে উদয় হয় প্রেমের ভাব। সেই ভাবের আলোয় সব অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হয়। মানুষ তখন বুঝতে পারে নিজের ভ্রম। বিশ্ব-বাসীকে আপনার জন বলে ভাবতে পারে। বহুদিনের সঞ্চিত কুসংস্কার, সংকীর্ণতা প্রভৃতি মানসিক ভাবগুলি একে একে বিদায় নেয়।

যুবক অনিমেষ নয়নে কবীরের মুখপানে তাকিয়ে রইলো। যত শুনছে ততই পাচ্ছে অপূর্ব তৃপ্তি—সীমাহীন আনন্দ। ভাবছে, এমন কথা তো এতোদিন শুনি নি। পঁচিশ বছর বয়েস হয়েছে। কৈ এমন কথা তো কেউ বলে নি এতোদিন?

ভাবলো, এ-মানুষ যে-সে লোক নয়। এর মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি নিশ্চয়ই আছে।

কবীর পুনরায় বলতে লাগলেন, আপনি কিছু ভুল করেন নি। আপনার পূর্ব জন্মের বা এ-জন্মের আবাল্য সংস্কারের বশীভূত হয়ে আপনি এমন সব কথাবার্তা বলেছেন। আপনার মনের এসব

ভাব একটি কারণে চলে যেতে পারে। আপনি সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হোন।

কবীর আর কোনো কথা বললেন না। নীরবে যুবকের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

যুবকটি অনুভব করলো, যেন কোনো এক শক্তি কবীরের নয়ন দু'টি হতে নির্গত হয়ে তার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করছে। প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে যুবকের মনে ভাবান্তর এলো। সে কবীরের পদতলে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, আমার অপরাধ হয়েছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

কবীর এবারও যুবকের কাণ্ড দেখে শিশুর মতো একগাল হাসলেন। তারপর তাঁর দু'টি বাহু সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ভূলুণ্ঠিত যুবককে মাটি থেকে তুললেন। বললেন, অমন দুর্বলচিত্ত হয়ো না। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান। মনকে সবল করো—সদ্‌গুরুর আশ্রয় নাও। তাহলে শান্তি পাবে।

যুবকটি বললে, গুরু কোথায় পাবো ?

কবীর বললেন, সন্ধান করলে নিশ্চয়ই পাবে। যাঁকে তোমার মনের মানুষ বলে ভাববে, তাঁকেই তুমি গুরুপদে বরণ করবে।

যুবকটি বললে, আমি তো খুঁজেছি অনেক। মনের মানুষ পেলুম কোথায় ? আপনি কি তাঁর সন্ধান দিতে পারেন ?

কবীর বললেন, তা দিতে পারি, তবে আমার ওপর তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। পারবে সে কাজ ?

যুবকটি বললে, হ্যাঁ।

এতক্ষণ যুবকের অন্তরটি অনুশোচনার দাবানলে পুড়ে যাচ্ছিল। এখন ভাবী গুরু কবীরের কাছ থেকে পরম আশ্বাস পেয়ে অনুভব করলো, তার হৃদয় এখন অনেকটা শান্ত। সে বললে, আপনি আমার গুরু। আপনি আমার হৃদয়ের সর্বস্ব ধন। আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।

কবীর বললেন, আগে মনকে তৈরী করো। তাকে সবল করে তোল আধ্যাত্মিক শক্তি গ্রহণ করার জন্যে। তারপর দেবো তোমায় দীক্ষা। সেদিন আর বেশী দেরি নেই।

এই কথা বলে কবীর অন্যত্র চলে গেলেন।

॥ চোদ্দ ॥

দেখা যদি দিলে তবে নিজেকে কেন লুকিয়ে রাখলে ? প্রকাশ হও স্বরূপে। কৃপা যদি করতে চাও তাড়াতাড়ি করো। বিলম্ব করে বিরহানলে দগ্ধ করো না হৃদয়। এমনি সব ভাব আসে যুবকের অন্তরে। কবীরের সান্নিধ্যে আসা এবং তাঁর কথা শোনার পর হতে যুবকের মনে বিশ্বাস ও ভক্তি গেলো বেড়ে। মন সর্বদা কবীরের কাছে পড়ে রইলো। শাস্ত্রে একেই তো বলে শরণাগতি।

সেদিন বাড়িতে ফিরে যুবকটি অনেক রাত পর্যন্ত ভাবতে লাগলো। ঘুম এলো না। ভাবলো, আমি ব্রাহ্মণের সন্তান। শাস্ত্রের নানারকম বিধিবিধানে আমার জীবনকে পিষ্ট করেছি। অথচ আমার জীবনে কণামাত্র উপলব্ধি হয় নি। ঈশ্বর আছেন একথা পুঁথিতে পড়েছি, কিন্তু অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি না। কবীর এমন কী কাজ করেছেন যার জন্যে তিনি এত উচ্চে উঠে গেছেন ! মনে মনে নানারকম চিন্তা এলো। আবার ভাবলো, তিনি আমাকে দীক্ষা দেবেন, আমিও তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে রাজী আছি। কিন্তু আমাদের সমাজ কি বলবে আমাকে ? বলবে, হিন্দুর ছেলে হয়ে তুই একজন মুসলমান পীরের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে গেলি ? কেন, হিন্দু সাধু কি পেলি না ?

যুবক যত ভাবে ততই যেন কেমন বিষণ্ণভাব এসে যেতে

লাগলো মনের মধ্যে। শেষকালে ভাবনা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন একটি সুমধুর সুখস্বপ্নে ঘুম ভাঙলো যুবকের। সে কবীরের কাছে নামমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। পরে কবীরের মেয়ে কমালীর সঙ্গে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি যুবক আশা করেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনার কথা যুবকটি কখনো কল্পনাই করতে পারে নি। আবার ভাবনা এসে চেপে বসলো মাথায়। অনেকবার চেষ্টা করেও তাড়াতে পারলো না। ভাবলো, কমালী তো মুসলমান জোলার মেয়ে। তার সঙ্গে কীভাবে আমার বিয়ে হতে পারে! দীক্ষা না হয় হতে পারে কমালীর বাবার কাছে। কারণ ঈশ্বরের কাছে কোন জাত বিচার নেই। তিনি হিন্দুর কাছে ঈশ্বর আবার মুসলমানের কাছে আল্লা। একই জিনিস কিন্তু বিভিন্ন জাতির মানুষের কাছে বিভিন্ন-ভাবে তিনি প্রকাশিত। মূলে কিন্তু রয়ে গেছে একই রহস্য। কৃষ্ণ-করিম, রাম-রহিম এক কথা। কিন্তু বিয়ে হবে কীভাবে! গুরুকন্যা তো অতিবড় উচ্চ বস্তু। তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে কীভাবে!

এমনি সব চিন্তা এলো যুবকের মনে। ভাবলো, একবার কবীরের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু এখুনি যেতে সাহস হলো না। কেননা, মনটা বড় দুর্বল। এই অবস্থায় কবীরের কাছে গেলে তিনি যদি কিছু বলেন?

কিন্তু ওরূপ ভাবলে কী হবে। পর দিন কবীর লোক মারফৎ যুবকটিকে কাছে আহ্বান জানালেন।

যুবক অনিচ্ছাসত্ত্বে গেল।

কবীর বললেন, তুমি স্বপ্নে যা যা জিনিস দেখেছো তা সবই সত্য। আগামী ওমুক দিনে তোমাকে আমি নামমন্ত্রে দীক্ষা দেবো আর অমুক মাসে অমুক দিনে কমালীর সঙ্গে তোমার সাদি হবে।

যুবক কোনো কথা না বলে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো। অন্তরে বয়ে যেতে লাগলো আনন্দের যমুনা।

কবীর বুঝতে পারলেন যুবকের মনের ভাব। নিজে থেকে বললেন, কোনোরকম চিন্তা করবে না। জানবে, এসব আল্লার ইচ্ছায় হচ্ছে।

এরপর কবীরের আদেশ এবং যুবকের স্বপ্ন কার্যকরী হলো। যুবক কবীরের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে তাঁর কন্যা কমালীকে বিয়ে করে সুখে ঘরসংসার করতে লাগলো।

॥ পনেরো ॥

কবীরের কাছে অনেকরকম ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ আসতে লাগলো ধর্মবিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্যে। কবীরও অনেকের কাছে যেতে লাগলেন। নিজের মনে কোনোরকম অহমিকা ছিল না তাঁর। নিজেকে সবসময়ে ঈশ্বরের দাস বলে ভাবতেন এবং সেই কারণে তাঁর নাম হলো কবীরদাস।

একদিন একজন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক এসে কবীরদাসকে প্রশ্ন করলে, সৎসাহেব, আপনি কোন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক? আপনি কি নতুন কোনো মতবাদ প্রচার করতে পৃথিবীতে এসেছেন?

উত্তরে কবীর কাব্যের ভাষায় বললেন,—

'সব ছুনী সয়ানী মৈঁ বৌরা,
হম বিগয়ে বিগরৌ জানি ঔরা।
মৈঁ নহিঁ বৌরা রাম কিয়ো বৌরা।
সতগুরু জার গয়ৌ ভ্রম মোরা।
বিদ্যা ন পঢ়ুঁ বাদ নহিঁ জাঁনূঁ,
হরি গুন কথত-সুনত বৌরাঁ নূঁ ॥

কাম-ক্রোধ দোউ ভয়ে বিকারা,
আপহি আপ জরৈঁ সংসারা ॥
মীটো কহা জাহি জো ভাবৈ
দাস কবীর রাম গুন গাবৈ ॥'

অর্থাৎ, সব তুনিয়া স্যায়না আর আমি পাগল। আমি বিগড়েছি কিন্তু আর কেউ যেন না বিগড়ায়। আমি পাগল নয়, রামই আমাকে পাগল করে দিলেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় আমার ভ্রম দূর হয়ে গেছে। লেখাপড়া শিখিনি, বিচারবিতর্কও জানি না। হরিগুণ-কীর্তন করে করে আর হরিগুণ-কীর্তন শুনে শুনে পাগল হয়েছি। কাম আর ক্রোধ এই তু'টি বিকৃত হয়েছে। সংসারটা নিজে নিজেই জ্বলে যাচ্ছে। মিষ্টি কোথায়, না, যার যা ভাল লাগে তাই মিষ্টি। তবে কবীরদাস রামগুণ গান করছে।

যে ঈশ্বরপ্রেমে একবার মজেছে তার কাছে জাগতিক সংসারের সুখতুঃখ ভস্মবৎ মনে হয়। আশ্রমও তাদের কাছে সংসার মনে হয়, সম্প্রদায় হয়ে ওঠে সমাজের প্রতিচ্ছায়া। সুতরাং ঈশ্বরপ্রেমিক কবীর নামরসে দিবারাত্র ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন। তিনি সম্প্রদায় বা মতের ধার ধারতেন না। তাঁর ভক্তরা তাঁকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তিনি তাতে রাজী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সকল প্রকার শাস্ত্রীয় বাধানিষেধ বা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির উর্ধ্বে।

আর একজন ভক্তকে বললেন কবীর, রাম পূর্ণব্রহ্ম। তাঁর মূর্তি নেই। তিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম। নাম নেওয়া উচিত নয়। কারণ তাতে করে তাঁকে ভিন্ন বোধ হবে। তিনি নির্গুণ। তিনি সগুণ-নির্গুণের অতীত সত্যস্বরূপ। তিনি শিব (পরমাত্মা) জীবমহলে অতিথি। রাম বেদকোরানের অগম্য। তিনি অগম অগোচর। তাঁকে চোখে দেখা যায় না। হাতেও ধরা যায় না। অথচ তিনি দেখা ও ধরা থেকে দূরেও নন। তিনি চাঁদ-ছাড়া-চাঁদনি অলস নিরঞ্জন রায়। তিনি অবিগত অকল অনুপম।

তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। কখনো কখনো তিনি এই দুই গুণের ওপারে থাকেন। যে-ভক্ত একবার ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে তাঁর সম্যক পরিচয় পেয়েছে, সে ঈশ্বরের সর্বপ্রকার রূপের বিষয় জানতে পারে।

কবীরদাসের ঈশ্বর দ্বন্দ্বাতীত, পক্ষাতীত, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, ত্রিগুণরহিত এবং অপরংপার পুরুষোত্তম।

আর একদিন একজন ভক্ত এসে কবীরদাসকে প্রশ্ন করলেন, ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?

কবীরদাস বললেন, তিনি অকথনীয় অচিন্ত্য। যে তাঁকে পায় সেও বলতে পারে না তিনি কেমন, যেমন বোবা গুড় খেলেও বলতে পারে না গুড় কেমন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, ব্রহ্মের স্বরূপের কথা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাঁকে কেবলমাত্র উপলব্ধি করা যায়। নুনের পুতুল সাগরের জল মাপতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। স্ত্রী কি কখনো বলতে পারে তার স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে কীরকম সুখ পায়?

একজন ভক্ত এসে কবীরদাসকে প্রশ্ন করলেন, ঈশ্বর কোথায় আছেন?

কবীরদাস বললেন, তিনি প্রতি নরনারীর হৃদয়ে রয়েছেন। প্রতিটি নর-নারীই হচ্ছে তাঁর রূপ। তিনি কোন সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ নন। মন্দির-মসজিদ—যোগ-বৈরাগ্য কোথাও তিনি নেই। তিনি রয়েছেন প্রাণের প্রাণে।

> ‘মোকোঁ কহাঁ ঢূঢ়ে বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ
> নামৈঁ দেবল নামৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাসমেঁ।
> না তো কৌন ক্রিয়া-কর্মমেঁ, নঁহী যোগ-বৈরাগমেঁ,
> খোজী হোয় তো তুরতৈ মিলিহৌঁ, পল-ভরঙ্গী তালাসমেঁ।
> কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, সব স্বাসোঁকী স্বাসমেঁ॥’

অর্থাৎ, ওরে বান্দা, আমায় তুই কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছিস। আমি তো তোর পাশেই রয়েছি। আমি দেউলে নেই, মসজিদে নেই, কাবাতে নেই, কৈলাসে নেই। আমি কোনো ক্রিয়া-কর্মেতে নেই। যোগ-বৈরাগ্যতেও নেই। যদি সন্ধানী হোস তাহলে খুব শিগগিরই পেয়ে যাবি, এক পলকের খোঁজাতেই। কবীর বলছেন, ভাই সাধু, শোনো, তিনি যে আছেন সব প্রাণের প্রাণে।

আসল কথা, কবীরদাস ছিলেন ভক্ত। ঈশ্বরকে ভক্তিভাবে প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। ভক্তির পথ হচ্ছে অত্যন্ত সহজ পথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার। সেখানে যোগ-বৈরাগ্য নাগাল পায় না। যোগীরা বহু আয়াস স্বীকার করে যোগসাধনার পথে ঈশ্বরকে লাভ করার চেষ্টা করেন, বৈরাগীরা অশেষ প্রকার কায়ক্লেশ সহ্য করে ঈশ্বরের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান, অথচ ভক্তেরা ভক্তির বলে ঘরে বসে হৃদয়মন্দিরে ঈশ্বরের আনন্দময় স্থিতি উপলব্ধি করতে পারে।

গীতায় 'ভক্তিযোগ' অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন,—

'এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং সে যোগবিত্তমাঃ॥'

অর্থাৎ, যাঁরা এরূপ কর্মযোগ তৎপর হয় ভক্তিসহকারে আপনার উপাসনা করেন তাঁরাই অধিক যোগী, না কি যাঁরা অব্যক্ত পরমাত্মার উপাসনা করেন তাঁরা অধিক যোগী?

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

'ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে যে যুক্ততমা মতাঃ॥'

অর্থাৎ, যাঁরা আমাতে মন আবেশিত করে আমাতে নিত্যযুক্ত হয়ে এবং আমাতে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা রেখে উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ যোগী।

কবীরদাস ছিলেন এই প্রকারের যোগী। তবে যোগকে কোনোদিন অশ্রদ্ধা করেন নি। তাকে বসিয়েছেন শ্রদ্ধার আসনে। তবে যোগের সঙ্গে জ্ঞান প্রয়োজন আর জ্ঞান এলেই আসবে ভক্তি। কারণ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি রয়েছে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে ছিলো জ্ঞান আর বাইরের কর্মে ছিলো ভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরে ছিলো ভক্তি এবং বাইরে জ্ঞান। কবীরদাসের অন্তরে ছিলো জ্ঞান আর বাইরে ভক্তি।

যোগপ্রসঙ্গে কবীরদাস বলেছেন, জ্ঞানকে বাদ দিয়ে যোগ হয় না। চরম সত্যকে শারীরিক ব্যায়াম আর মানসিক শমদমের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। যোগের প্রতিপাদ্য যে পরমপুরুষ তিনি আত্মগম্য, চোখ আর কানের বিষয় নয়। যথার্থ জ্ঞান হলেই তবে তাঁকে পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃত যোগী আছেন ক'জন? বেশীর ভাগই তো ভেকধারী। তাদের প্রতি কবীর তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন—

'মন না রগাঁয়ে রগাঁয়ে জোগী কপড়া।
আসন মারি মন্দিরমেঁ বৈঠে
ব্রহ্ম-ছাড়ি পূজন লাগে পথরা॥
কনবা ফড়ায় যোগী জট বা বঢ়ৌলে,
দাঢ়ী বঢ়ায় জোগী হোই গৈলে বকরা।
জঙ্গল জায় জোগী ধুনিয়া রমৌলে
কাম জরায় জোগী হোয় গৈলে হিজরা॥
মথবা মুঁড়ায় জোগী কপড়া রঙ্গৌলে,
গীতা বাঁচকে হোয় গৈলে লবরা
কহহিঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো।
জম দরবজবা বাঁধল জৈবে পকড়া॥'

অর্থাৎ, হে যোগী, মন না রাঙ্গিয়ে রঙ্গালি কাপড়। আসন করে বসলি মন্দিরে। ব্রহ্মকে ছেড়ে পূজো করতে লাগলি

পাথর। ওরে যোগী, কান ফুটো করলি, জটা রাখলি আর দাড়ি রেখে হয়ে গেলি ছাগল। জঙ্গলে গিয়ে ধুনি জ্বাললি। রে যোগী, কামকে জীর্ণ করে হিজড়া হয়ে গেলি। যোগী রে, মাথা মুড়ালি রঙ্গালি কাপড় আর গীতা পড়ে পড়ে হয়ে গেলি মিথ্যাবাদী। কবীর বলছে, সাধু রে ভাই শোন্, তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে যম দরজায় রাখবে।

ভগবদ্ সাধনায় বাহ্যিক আচার-বিচার অতিবড় তুচ্ছ জিনিস। এগুলির ওপর কোনোরকম গুরুত্ব আরোপ করতেন না কবীরদাস।

মুসলমানরা চীৎকার করে মসজিদে আজান দেয়। ঈশ্বর কী কালা! তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র রয়েছেন। তিনি ভক্তের সবকথা শুনতে পান, সে ফিস্ফিস্ করে বলুক আর গুঞ্জন ধ্বনিতে বলুক না কেন।

কবীরদাস বলেছেন,—

'না জানৈ সাহব কৈসা হৈ।
মুল্লা হোকর বাংগ জো দেবৈ,
ক্যা তেরা সাহব বহরা হৈ।
কীড়ীকে পগ নেবর বাজে,
সো ভি সাহব সুনতা হৈ।
মালা ফেরী তিলক লগায়া,
লম্বী জটা বঢ়াতা হৈ।
অন্তর তেরে ফুকর-কটারী,
যোঁ নহিঁ সাহব মিলতা হৈ॥

অর্থাৎ, জানি না তোর প্রভু কী রকম। মোল্লা হয়ে যে আজান দিস্, তোর প্রভু কী কালা! ক্ষুদ্র কীটের পায়ে নূপুর বাজে তাও প্রভু শুনতে পান। মালা ফিরাচ্ছিস, তিলক কেটেছিস, রেখেছিস লম্বা জটা। ওরে তোর ভেতরে যে রয়েছে অবিশ্বাসের ছুরি, এতে করে প্রভুকে পাওয়া যায় না।

সাধু-সন্ন্যাসিগণ মাথায় জটা রাখেন, মূর্তি পুজো করেন, নানা-রকম ক্রিয়া-আচার পালন করেন। কবীর বলছেন, এ সবের পেছনে যদি তত্ত্ববিচার না থাকে বা এসবের দ্বারা যদি ঈশ্বরকে লাভ করা না যায়, তাহলে এগুলি দিয়ে কী হবে !

কবীর বলেছেন,—

'অবধূ ভজন ভেদ হৈ ন্যারা।
ক্যা গায়ে ক্যা লিখি বতলায়ে, ক্যা ভর্মে সংসারা।
ক্যা সন্ধ্যা-তর্পনকে কীন্হেঁ, জো নহি তত্ত্ব বিচারা।
মূঁড় মুড়ায়ে সির জটা বখায়ে, ক্যা তন লায়ে ছারা।
ক্যা পূজা পাহনকী কীন্হেঁ, ক্যা ফল কিয়ে অহারা।
বিন পরিচে সাহিব হো বৈঠে, বিষয় করৈ ব্যোপারা।
জ্ঞান-ধ্যানকা মর্ম ন জানৈ, বাদ করৈ অহংকারা।
অগম অথাহ মহা অতি গহিরা, বীজ ন খেত নিবারা।
মহা সো ধ্যান মগন হৈব বৈঠে, কাট করমকী ছারা।
জিনকে সদা অহার অন্তরমেঁ কেবল তত্ত্ব বিচারা।
কহেঁ কবীর সুনো হো গোরখ তারে ৗ সহিত পরিবারা।'

অর্থাৎ, ওহে অবধূত, ভজনের রহস্য অন্য প্রকার। যদি তত্ত্ববিচার না হয় তাহলে গান করলেই বা কী হবে। লিখে লিখে বোঝালেই বা কী হবে। সারা জগৎময় ঘুরে বেড়ালেই বা কী হবে। আর সন্ধ্যাতর্পণেই বা কী হবে। মাথা মুড়োলেই বা কী হবে। মাথায় জটা রাখলেই বা কী হবে। গায়ে ছাই মাখলেই বা কী হবে। পাথরের পূজো করলেই বা কি হবে। ফলমূল আহার করলেই বা কি হবে। পরিচয় (ভগবানের সঙ্গে) ছাড়াই তুমি মালিক হয়ে বসেছো আর বিষয় নিয়ে কারবার করতে লেগেছো। জ্ঞানধ্যানের মর্ম জান না, শুধু বৃথাই অহঙ্কার করছো। এ-রকম অহঙ্কারী অগম অপরিমিত অতি গভীর ভজনভেদরূপী বীজ আপন হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করে নি। কিন্তু যে সাচ্চা ভক্ত এই অহঙ্কার নষ্ট করেছেন, তিনি কর্মের বন্ধন

কেটে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন। কবীর বলছেন, ওহে গোরখ, শোনো, অন্তরে সর্বদা তত্ত্ববিচারই যাঁদের আহার তাঁরা পরিজনসহ উদ্ধার পেয়ে যান।

তখনকার দিনে ভারতীয় যোগীদের মধ্যে বাহ্যিক আচার বা ভড়ং ছিলো প্রধান। অন্তরের উন্নতি বা তত্ত্বজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি যেতো না বেশী। নাথসম্প্রদায়ের অন্যতম যোগী গোরখনাথের উদ্দেশ্যে কবীর এই প্রকার উক্তি করেছেন। তাঁর এই উক্তিটি এ যুগে অনেক ভণ্ড বা ভেকধারী যোগীদের পক্ষে প্রযোজ্য।

বৈধী ভক্তিলাভ করতে হলে ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু মানুষের মন সবসময় আচারসর্বস্ব বা অনুষ্ঠানপ্রধান হয়ে উঠলে চলবে না। আচার-অনুষ্ঠানের মূলে যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারার উপায় যেন ধর্মধ্বজীদের মন থেকে বিদূরিত না হয়। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে মূল লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে এগিয়ে যাওয়া। কবীরদাস ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। তিনি এগুলিকে বাচ্চা মেয়েদের পুতুল খেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন,—

'পূজা-সেবা-নেম-ব্রত, গুড়িয়নকা-সা খেল।
জব লগ পিউ পরসৈ নহীঁ, তব লগ সংসয় মেল॥'

অর্থাৎ, পূজা সেবা নিয়ম ব্রত এসব যেন ছোট মেয়ের পুতুল খেলা। যতক্ষণ প্রিয়তম স্পর্শ না করেছেন ততক্ষণ এসব অনেক সংশয় থাকে।

আজকাল পূজা-আচ্চা (বিশেষ করে বারোয়ারী) যেমন আকার ধারণ করেছে তাতে করে কবীরদাসের এই বিখ্যাত দোঁহার বৈশিষ্ট্য আজও সম্যকভাবে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য বস্তুকে হারিয়ে তার কঙ্কালমাত্র সার করে চলেছি বলে আজ আমরা দিন দিন ধর্ম হতে দূরে চলে যাচ্ছি এবং নিত্যনৈমিত্তিক সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ভোগ করছি।

মহাভাগবত কবীরদাস শিখগুরু নানকের সঙ্গে অনেক সময় মানবধর্ম নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। গুরু নানক কবীরের কাছ থেকে অনেকরকম সাহায্য পেয়েছেন তাঁর নতুন ধর্ম 'শিখধর্ম' প্রচারের অনুকূলে। এমন কী শিখসম্প্রদায়ের বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেবে' কবীরের উক্ত অনেক দোঁহা স্থান পেয়েছে।

কবীরদর্শনের মূলকথা হচ্ছে, মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে লাভ করা এবং সেইমত লৌকিক ধর্মের ধারা নিয়ন্ত্রিত করা। তা নাহলে মিথ্যা আচার বা সংস্কারসর্বস্ব ধর্মমত নিয়ে মানবসংসারে এবং ব্যক্তিজীবনে কোনো কল্যাণ হবে না, আর ভগবানের করুণাও কোনোদিন পাওয়া যাবে না।

॥ ষোল ॥

মায়ের কাছ থেকে ভর্ৎসনা পেয়ে কবীরদাস নিয়মিতভাবে তাঁত বুনতে থাকেন। তাঁত বোনার সময় তিনি কখনো ভুলতেন না রামনাম। দু'হাতে তালে তালে 'সীতারাম', 'সীতারাম' বলতেন।

একদিন একখানা কাপড় বুনে নিয়ে হাটে এসেছেন কবীরদাস। হাটের এককোণে এসে দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে। এমন সময় এক বৈষ্ণব এসে তাঁর কাছে সেই কাপড়খানি ভিক্ষে চাইলো।

বৈষ্ণবের কথা শুনে কবীরের চিত্ত করুণারসে আর্দ্র হয়ে উঠলো। ভুলে গেলেন সংসারের অভাব-অভিযোগের কথা। ঐ কাপড় বিক্রি করে যে পয়সা পাবেন, তাই দিয়ে খাদ্যদ্রব্য কিনে নিয়ে ফিরবেন বাসায়। তাহলে বাড়ির লোকেরা কিছু পেটে দিতে পারবে। অথচ কবীরদাস সংসারের অভাবের কথা সেই সময়ের

জন্যে ভুলে গেলেন। তিনি তখুনি কিছুমাত্র চিন্তা না করে বৈষ্ণবকে দিয়ে দিলেন কাপড়খানা।

কিন্তু কবীর ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। ইষ্টদেবতা বিচলিত হয়ে পড়লেন ভক্তের আসন্ন দুঃখ দেখে। কবীর রিক্ত হাতে বাড়ি ফিরলে তাঁর মা বলবেন কি? তাঁকে অযথা তিরস্কার করবেন। এই কারণে শ্রীরামচন্দ্র নিজে কবীরের বেশ ধরে দেখা করলেন কবীরের মার সঙ্গে। তাঁর হাতে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য অর্পণ করে ফিরে গেলেন।

এদিকে খানিকক্ষণ বাদে কবীর রিক্ত হাতে ফিরলেন বাড়িতে। ফিরে দেখলেন, ভোজ্যদ্রব্যে গৃহ পরিপূর্ণ। তিনি তখন বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলেন, মা! এত জিনিস কোথা হতে এলো?

মা বললেন, কেন বাছা, তুই যে এইমাত্র এসব জিনিস এনে রেখে গেলি।

মায়ের কথা শুনে কবীর বুঝতে পারলেন সমস্ত রহস্যটি। ভাবলেন, এ তাঁর ওপর প্রভুর অনন্ত কৃপা। তিনি ভক্তের দুঃখ লাঘব করার জন্যে ভক্তবেশে ভক্তের বাড়িতে এসে কৃপা করেছেন।

তখন কবীর গদগদ হয়ে মনে মনে অসংখ্য প্রণাম নিবেদন করলেন ইষ্টদেবতাকে। পরে সেই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার বৈষ্ণবদের মধ্যে বিতরণ করলেন অযাচিতভাবে।

সকলে কবীরের উদারভাবের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলো। কেউ কেউ আবার হিংসানলে জ্বলেপুড়ে মরলো।

॥ সতেরো ॥

কবীরদাস ভারতের বাইরে ভ্রমণ করেন। মক্কা, বাগদাদ, সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে তিনি সাধকদের সঙ্গে দেখা করে ধর্মবিষয়ে নানারকম উপদেশ নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর প্রধানতম আক্রমণ ছিল ধর্মের বাহ্যিক সংস্কার বা বহ্বারম্ভের বিরুদ্ধে। তিনি বেদ-কোরান, পুরোহিত-মোল্লা, মন্দির-মসজিদ, তীর্থ-হজ, ব্রতোপবাস-রোজা, সন্ধ্যাহ্নিক-নমাজ কিছুই মানতেন না। তিনি কেবল মানতেন সদ্‌গুরুর কৃপা এবং তার দ্বারাই শিষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বরসম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধি সম্ভব। গুরুদত্ত মন্ত্রে আস্থা রেখে তাহাই যথাযথ অনুশীলন করে যেতে পারলে, শিষ্য সত্বর ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করতে পারবে।

ভক্ত কবীরের এই প্রকার সুউচ্চ ও সূক্ষ্ম দর্শনতত্ত্ব সাধারণ হিন্দু-মুসলমান সজ্ঞানে এবং শান্ত চিত্তে মেনে নিলো না। তারা দলবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানালো। বিশেষ করে গোরখনাথের মতো যোগী এবং সর্বানন্দ নামে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে তর্কবিতর্কে মহাত্মা কবীরের মতামত যখন জয়ী হলো, তখন থেকে তারা তাঁর প্রতি আরও বিরূপ মত পোষণ করতে লাগলো। কবীরকে জব্দ করবার জন্যে নানাপ্রকার ফন্দী আঁটতে লাগলো। কিন্তু কবীরের প্রতি ঈশ্বরের করুণা এমনভাবে বর্ষিত হয়েছিল যে, তাদের সর্ব-প্রকার দুষ্ট অভিসন্ধি সমূলে নাশ হয়ে গেলো। তখন তারা অনন্যোপায় হয়ে চলে এলো বাদশা সিকন্দর লোদীর কাছে।

মুসলমানরা এসে বাদশাকে বললে, জাঁহাপনা, কবীর আমাদের ধর্ম নষ্ট করলো। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

হিন্দু প্রজারাও তেমন অভিযোগ জানালো।

বাদশা তখন উভয় পক্ষের কাছ থেকে সমান মানের অভিযোগ পেয়ে ভাবলেন, কবীর তো অবশ্যই অপরাধী।

তখন তিনি তাঁর পারিষদদের বললেন, কবীরকে বন্দী করে এখুনি আমার দরবারে এনে হাজির করো।

হুকুম তামিল করলো পারিষদবর্গ। তারা যথাসময়ে কবীরকে বন্দী করে এনে হাজির করলো দরবারে।

বাদশা প্রশ্ন করলেন কবীরকে, কবীর, তুমি মুসলমান ঘরে জন্মে কাফেরের ধর্ম গ্রহণ করেছ কেন? তুমি আল্লাকে ভজনা করো না কেন?

বাদশার কথা শুনে কবীর বললেন, ঈশ্বর এক। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কাছে জাতিবিচার নেই। যে-কোনো জাতের মানুষ তাঁকে ভজনা করতে পারে। তিনি হিন্দুরও নন আবার তিনি মুসলমানেরও নন, তিনি সকলের। যে-কোনো লোক তাঁকে ভক্তিভাবে অর্চনা করুক না কেন, সে তাঁকে লাভ করবে।

বাদশা তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলেন, আমি ভারতের সার্বভৌম সম্রাট। তোমার মুখে আটকালো না এমন সাহসের সঙ্গে কথা বলতে?

কবীর বললেন, আমি যা সত্যি বলে জেনেছি, সেই কথাই বললুম আপনার কাছে। আপনি যদি আমার কথা ভাল নজরে না দেখেন তো আমাকে ইচ্ছামতো শাস্তি দিন। আমি মাথা পেতে নেবো আপনার দেওয়া শাস্তি।

বাদশা অবাক হয়ে গেলেন কবীরের মুখে সদীপ্ত উত্তর শুনে। ভাবলেন, একজন দরিদ্র ফকিরের এতো বড় স্পর্ধা! সে ভারত-সম্রাটের সামনে এমন কথা বলতে পারে!

সম্রাট বললেন, আমার শাস্তি বড় কঠিন। তুমি কি পারবে তা গ্রহণ করতে? মনে হয় তুমি পারবে না। তার চেয়ে তুমি নিজের ধর্ম গ্রহণ করে শান্তিতে বসোবাস করো। কি প্রয়োজন

তোমার হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা? আল্লার পবিত্র নাম নাও। দেখবে, তোমার উন্নতি হবে।

কবীর বললেন, আমি তো আগেই আমার বক্তব্য বলে দিয়েছি। আপনি শতবার বললেও আমি আমার আদর্শ হতে বিচলিত হবো না। আমি ঠিক আমিই আছি। আমি জীবনে গুরুকৃপাবলে যেটুকু সত্য উপলব্ধি করেছি, তাতে এইটুকু জেনেছি—আল্লা বা হরি উভয়ে এক। আমাদের চোখে তাঁরা পৃথক হলেও তিনি কখনো পৃথক হতে পারেন না। জল জলই। হিন্দুরা বলে জল আর মুসলমানরা বলে পানি। কিন্তু তাতে করে জলের তো কোন ক্ষতি হয় না। তার গুণ অবিকৃত থাকে। তার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের তৃষ্ণা মেটে।

কবীরের কথা মনঃপূত হলো না বাদশার। তাঁর ক্রোধ গেলো বেড়ে। তিনি পারিষদদের হুকুম দিলেন, কবীরকে বেঁধে জলে ফেলার ব্যবস্থা করো। তাহলে ও বাঁচবে না, মরে যাবে। রাজ্যে শান্তি আসবে।

পারিষদবর্গ বাদশার কথা শুনলো। কবীরের হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে যমুনার জলে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু কবীর তার জন্যে বিচলিত হলেন না। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেলো, কবীর বন্ধনমুক্ত অবস্থায় হাসতে হাসতে ড্যাঙায় এসে উঠেছেন।

তখন পারিষদবর্গ বাদশার কাছে এসে অভিযোগ করলো, জাঁহাপনা, কবীরের তো মৃত্যু হলো না। সে তো নিরাপদে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে।

বাদশা বললেন, বেশ, এবার ওকে সুউচ্চ পাহাড় হতে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করো। তাহলে ও মারা যাবে।

বাদশার আদেশ পালন করার জন্যে এগিয়ে গেল পারিষদবর্গ। তারা কবীরের হাত-পা আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে সুউচ্চ পর্বতচূড়া হতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করলো।

এবারও কবীরের প্রাণবায়ু নির্গত হলো না দেহ থেকে। তিনি হাসতে হাসতে উঠে এলেন সুস্থ শরীরে। মুখে তাঁর রামনাম।

বাদশা শুনলেন দ্বিতীয়বারের ঘটনা। শুনে বললেন, বেশ, এবার ওকে বেঁধে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করো। তাহলে তার প্রাণ চলে যাবে।

বাদশার অনুরাগীরা তাঁর আদেশ শিরোধার্য করলো। কিন্তু এবারও সেই একই রকম দৃশ্যের অবতারণা হলো। প্রাণে বেঁচে রইলেন ভক্ত কবীর।

তখন বাদশা বিস্মিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, কবীরের অলৌকিক শক্তির কথা আর তাঁর বাণীর তাৎপর্য। তিনি কবীরকে ডেকে পাঠালেন। পারিষদগণ বন্দী অবস্থায় নিয়ে এলেন কবীরকে বাদশার সামনে।

কবীর আসতেই বাদশা তাঁর দিকে শান্ত নয়নে তাকালেন। দেখলেন, কবীরের আয়তনেত্রে প্রশান্তি নেমে এসেছে পূর্ণকলায়। তার মাঝে রয়েছে অনন্ত শান্তির জ্যোতি। সেই জ্যোতিতে দৃষ্টি অবগাহন করলো বাদশার। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন সর্বাঙ্গে অলৌকিক দিব্যানন্দ। সেই আনন্দের মাত্রা এমনিভাবে বৃদ্ধি পেলো যে, নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে পড়ে গেলেন কবীরের পাদপদ্মে। পরম ভাগবতের সঙ্গে মিলন হলো দিল্লীর বাদশার। এরপর থেকে বাদশার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তিনি অনুচরদের ডেকে আদেশ দিলেন, তোমরা এখুনি প্রচার করে দাও সারা ভারতের জনসাধারণের কাছে, কবীরের প্রতি যেন কেউ কোনোরকম বিদ্বেষভাব পোষণ না করে।

অনুচররা তাই করলো। সেদিন থেকে হিন্দু-মুসলমান যারা কবীরদাসের মতের প্রবল বিরোধিতা করেছিলো, তারা সতর্ক হয়ে গেলো।

কবীরদাস ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে চললেন

বাদশার প্রাসাদ থেকে। যাবার আগে বাদশা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

ভক্ত কবীরদাসের ছ'টি চক্ষু জলে পূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি প্রেমবিগলিত কণ্ঠে বললেন বাদশাকে, আপনার কোন অপরাধ হয় নি। হয়তো আমার কোনো দোষ হয়ে থাকবে তার জন্যে আল্লা আমাকে এমনভাবে পরীক্ষা করলেন।

॥ আঠারো ॥

সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ঘরের মানুষ পর্যন্ত অনেকেই কবীরদাসের কাছে দীক্ষা নেন। তাঁদের মধ্যে রাজা বীরসিংহ এবং ধর্মদাস কবীরদাসের বেশ নামকরা এবং অভিজাত শ্রেণীব শিষ্য ছিলেন। এ ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ কবীরদাসের কাছে আসতে লাগলো। তারা ধর্মকথা শুনতে আসতো না। আসতো সংসারের প্রয়োজন মেটাতে।

একদিন একজন লোক এলো কবীরদাসের কাছে। বললে, বাবা, আপনার অলৌকিক শক্তির কথা অনেক শুনেছি। আপনি স্পর্শ করলে মানুষের শরীর ব্যাধিমুক্ত হয়। আমার ছেলেটা অনেক দিন ধরে রোগে ভুগছে। আপনি যদি ওকে ভালো করে দেন।

কবীরদাস বললেন, আমি কি ভগবান? আমি তো তোমার মতো সাধারণ মানুষ। তুমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। তিনি তোমার মঙ্গল করবেন।

লোকটি কিন্তু কবীরদাসের কথা শুনলো না। বারংবার তাঁর কাছে এসে বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগলো।

তখন কবীরদাস বাধ্য হয়ে অন্য উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। ভাবলেন, আমি যদি অন্য উপায় অবলম্বন করে এসব লোকদের দূরে সরিয়ে দিতে না পারি, তাহলে সাধনভজনে আসবে প্রবল ব্যাঘাত। অতএব যেমন করে হোক আমাকে একটি নতুন পন্থা ভেবে দেখতে হবে।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই কবীরদাসের মনে পড়ে গেলো, একটি কাজ করলে মন্দ হয় না। কাছেই বাজার এলাকায় অনেক বারাঙ্গনা আছে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়দিন আমার কাছে আসে। এসে ধর্মকথা শুনে যায়। ওদের দু'একজনকে ডেকে এনে যদি এখানে বসাই, তাহলে ওদের দেখে আমার কাছে আর কেউ আসতে সাহস করবে না। ভাববে আমি ভণ্ড সাধু—বেশ্যাসক্ত।

একদিন কবীরদাসের আহ্বান পেয়ে বারানসীর অন্যতমা নাম-করা বেশ্যা হীরামতি এলো। তার যেমন রূপ তেমনি শাঁসালো যৌবন।

কবীরদাস যেখানে—যে বেদীর ওপর বসেছিলেন, হীরামতিও সেখানে বসলো। সে অবাক বিস্ময়ে কবীরদাসের সাধনপ্রণালী দেখতে লাগলো। কবীরদাসের কিন্তু কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ রইলো না, কিবা হীরামতী, কিবা জনসাধারণ। তিনি আপনমনে নামযজ্ঞ করে চলেছেন।

এমনিভাবে অনেকদিন গেলো। তখন কবীরদাসের কাছে কোনো লোক আসতো না। অনেকে বললে, কবীরসাহেবের মৃত্যু হয়েছে। কেউ বা বললে, কবীরদাসের অধঃপতন হয়েছে, নইলে সে মেয়ে-মানুষ রাখলো কেন?

এই লোকনিন্দা কবীরদাসের চিত্তে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করলো না। বরং শাপে বর হলো। সাধকের নিয়ম হচ্ছে যতটা সম্ভব লোকসঙ্গ এড়িয়ে থাকা। কারণ নির্জনে যতো বেশী এবং গভীরভাবে

সাধনা করা যায়, সংসারে বা লোকসমাজে বসোবাস করে তেমনটি হয় না।

এমনিভাবে কবীরদাস লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে সাধনভজন করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বাইরে এসে লোককল্যাণকর কাজে ব্রতী হতেন।

॥ উনিশ ॥

পৃথিবীতে অনেকদিন মানবদেহ ধারণ করে রইলেন কবীরদাস। ঈশ্বরের বিধানমতো কাজ করলেন লোককল্যাণের জন্যে। এবার তাঁকে যেতে হবে অন্যলোকে। এ দেহ নিয়ে তো আর যাওয়া যাবে না। সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে যাবেন দেবলোকে। ভক্তদের কানে গেলো সংবাদটি। তারা দলে দলে আসতে লাগলো কবীর-দাসের কাছে।

কবীরদাস তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, তোমাদের কল্যাণ হোক। ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের মন-প্রাণ সমর্পিত হোক।

হিন্দু-মুসলমান সকল শিষ্যকেই তিনি ঐ একই আশীর্বাণী বললেন।

তারপর বললেন, অমুক দিনে মঘরে আমি দেহরক্ষা করবো।

হিন্দু ভক্তগণ সমস্বরে বললে, কাশী তো পরম তীর্থ। শুনেছি, এখানে দেহত্যাগ করলে জীবের উর্ধ্বগতি লাভ হয়। তাহলে আপনি কাশী ছেড়ে মঘরে যাবেন কেন?

ভক্তদের কথা শুনে কবীরদাস বললেন, আমি যা বলেছি তার এতোটুকুও নড়চড় হবে না। স্থানবিশেষে দেহত্যাগ করলে মানুষের বিশেষ কোনো গতি হবে, এ কাজের কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে,

যার হৃদয়ে রয়েছে রাম তার কাছে সব জায়গাই সুন্দর এবং পবিত্র। সে যেখানেই দেহত্যাগ করুক না কেন, তার হবে সদ্‌গতি। সেই পাবে মুক্তি। তাছাড়া আর কিছুতে মুক্তি নেই।

'লোকা মতিকে ভোরা রে।
জো কাসী তন তজৈ কবীরা,
তৌ রামহিঁ কহা নিহোরা রে।
তব হম বৈসে অব হম ঐসে,
ইহৈ জনমকা লাহা রে॥
রাম-ভগতি-পরি জাকৌ হিত চিত
তাকৌ অচিরজ কাহা রে।
গুর-প্রসাদ সাধকী সঙ্গতি,
জগ জীতেঁ জাই জুলাহা রে।
কহৈ কবীর সুনহু রে সন্তো,
ভ্রমি পরৈ জিনি কোঈ রে।
জয় কাসী তস মগহর উসর
হিরদৈ রাম সতি হোঈ রে।'

অর্থাৎ, ওরে লোকগুলো মতিভ্রষ্ট হয়েছে। কবীর জিজ্ঞেস করছেন, যদি কবীর কাশীতেই মরেন তাহলে আর রামের কাছে কাকুতি-মিনতি করা কেন। তখন আমি ঐ রকম ছিলুম এখন যে এরকম হয়েছি, এইটেই আমার জীবনের লাভ। রামের প্রতি ভক্তিতে যার চিত্ত নিবিষ্ট তার পক্ষে এ আর আশ্চর্য কী। ওরে গুরুর প্রসাদ আর সাধুসঙ্গ এই দিয়ে জোলা জগৎ জয় করে যাবে। কবীর বলছে, ওহে সন্ত শোন, কেউ যেন ভ্রমে না পড়ে। কাশী আর মগহর তুই-ই উষর স্থান (কোনোরকম ফলপ্রসূ নয়)। হৃদয়ে যে রাম থাকে তাই সত্য।

কবীরদাসের কথা শুনে ভক্তরা কিছু বললো না।

নির্দিষ্টদিনে কবীরদাস যাত্রা করলেন মঘরের দিকে। হিন্দু-

মুসলমান মিলিয়ে প্রায় হাজার দশেক শিষ্য তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। হিন্দুদের দলপতি হলেন রাজা বীরসিংহ আর মুসলমানদের বিজলী খাঁ।

মঘরের নিকট দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছতোয়া অমা নদী। তারই তীরে একটি নির্জন জায়গায় ছিল একটি ছোট্ট সাধনকুটির। একসময়ে এখানে এক সাধু থাকতেন। তিনি সাধনভজন করতেন। অনেকদিন হলো তিনি এই কুটির ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছেন। তাই কুটিরটি শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। কবীরদাস সেই কুটিরে প্রবেশ করলেন। তাঁর শিষ্যগণ সাশ্রুনয়নে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কবীরদাস কুটিরের মধ্যে আসন বিছিয়ে বসলেন। তারপর তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করে বললেন, তোমরা আমার জন্যে কিছু শাদা পদ্মফুল আর তু'খানা শাদা চাদর নিয়ে এসো।

খানিকবাদে গুরুর আদেশ মত শিষ্যেরা নিয়ে এলো একরাশ পদ্মফুল আর তু'খানা চাদর।

অবশেষে সেই মহালগ্ন এলো। কবীরদাস এবার নশ্বর দেহ ত্যাগ করবেন—মিলবেন গিয়ে পরমাত্মায়। অন্তরে উপলব্ধি করতে লাগলেন মহাবাণী।

অতঃপর তিনি সকলকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, তোমরা আর এখন এখানে ভিড় করো না। আমি একটু ঘুমুবো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তোমরা সব চলে যাও।

রাজা বীরসিংহ বুঝলেন, এই বোধহয় গুরুজীর শেষ নিদ্রা। আর কোনোদিন তাঁকে পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না। তখন তিনি এগিয়ে এসে গুরুকে প্রণাম করে বললেন, গুরুজী, কৃপা করে অনুমতি করুন, নিত্যধামে আপনি চলে যাবার পর আপনার পবিত্র দেহ নিয়ে আমি বিশুদ্ধ হিন্দুপ্রথা অনুসারে তার সৎকার করবো।

বীরসিংহের কথা মনের মত হলো না বিজলী খাঁর। তিনি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন, এ কখনো হতে পারে না। আমি এই পবিত্র দেহ মুসলমান মতে কবর দেবো।

মহামুশকিলে পড়লেন কবীরদাস। দেখলেন, উভয়ের দলে সৈন্যসামন্ত প্রচুর। এখনি এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে একটা মহা অনর্থ বাঁধতে পারে। তখন তিনি উভয় পক্ষকে তিরস্কার করে বললেন, তোমাদের প্রতি আমার এই আদেশ, তোমরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো বাগ্‌বিতণ্ডা করতে পাববে না আর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবে না। গুরুর আদেশ পালন করলে তার কল্যাণ হবে।

দুই দলই গুরুর আদেশ শিরোধার্য করলেন। এবার ভিড় সরে গেলো। কবীরদাস চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়লেন।

শিষ্যেরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। দরজা বন্ধ করে দিলো।

খানিকক্ষণ পরে ঘরের ভেতর থেকে একটা শব্দ শোনা গেলো।

শিষ্যেরা অঝোরে কাঁদতে লাগলো। গুরুজী মহাপ্রয়াণ করেছেন। চলে গেছেন নিত্যধামে—সত্যলোকে, যেখানে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু এসব কিছুই নেই। কেবল নিত্য আনন্দময় আত্মা বিরাজমান।

ঐ অবস্থায় অনেকক্ষণ কেটে গেলো। তারপর শিষ্যেরা ধীরে ধীরে দরজা খুলে ফেললো। দেখলো, ঘরের ভেতরে এক অপূর্ব দৃশ্য! ঘরের মধ্যে গুরুজীর নশ্বর দেহ নেই। আছে দু'খানি চাদর আর প্রত্যেক চাদরের ওপরে একরাশ করে পদ্মফুল।

শিষ্যদের মন হতে বিষাদভাব কেটে গেলো। রাজা বীরসিংহ পদ্মফুলসমেত একটি চাদর নিয়ে চলে এলেন কাশীতে। এখানে দশাশ্বমেধ ঘাটে সেগুলি দাহ করলেন। তারপর তার চিতাভস্ম নিয়ে প্রোথিত করলেন একটি জায়গায়। সেই জায়গাটি আজও

'কবীর-চৌরা' নামে বিখ্যাত। আজও শত শত তীর্থযাত্রী সেখানে যায় ভক্ত ও মহাত্মা কবীরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

মুসলমান শিষ্যদের দলনেতা বিজলী খাঁ মঘরেই পদ্মফুলসমেত একটি চাদর সমাধিস্থ করলেন।

পরে ওখানে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ চেষ্টায় একটি মঠ গড়ে ওঠে। আজও তা বিদ্যমান রয়েছে।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কবীর দেহত্যাগ করেন। তাঁর জন্ম হয় ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে। এই পরম ভাগবতের প্রতি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় আজও সভক্তি প্রণাম নিবেদন করেন। ভারতীয় সাধকদের মধ্যে ইনিই বোধহয় ব্যতিক্রম—যিনি একসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করে অমর হয়ে আছেন। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এ এক বড় অভিনব ঘটনা।

॥ বিশ ॥

মহাত্মা কবীরের বহু দোঁহা আছে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি এই গ্রন্থে সঙ্কলন করেছি। দোঁহাগুলি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে বোঝা যাবে, কবীর কতো উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল। তিনি একাধারে যোগী, বৈদান্তিক, প্রেমিক এবং ভক্ত। তাঁর সাধনশক্তি তুলনাহীন।

কবীর বলেছেন,—

'জগৎ জানায়ো যোহি সকল, সো গুরু প্রগটে আয়ে।
যিন্‌হ্ আঁখিয়ন্‌হ্ গুরু দেখিয়েঁ। সো গুরু দেহি লখায়ে।'

অর্থাৎ, (জগৎ) গতিশীল বস্তু সকলকে যিনি জানালেন সেই গুরু প্রকাশ হলেন। যে নয়নে গুরু দেখবো সেই নয়ন দেখিয়ে দিলেন গুরু।

'কবীর ভলি ভৈঁয়ি যো গুরু মিলে, নেহিতো হোতি হানি।
দীপক্ জ্যোতি পতঙ্গ্ যেওঁ, বর্‌তা পূরা জানি।'

অর্থাৎ, গুরু মিললো বলে কবীরের বড় ভাল হলো। তা নাহলে হানি হতো। কারণ আত্মহারা হয়ে পতঙ্গের মত দীপশিখায় ভ্রমবশতঃ প্রাণত্যাগ করতে হতো।

'কবীর ভলি ভৈঁয়ি যো গুরু মিলে,
যিন্ হতে পায়ো জ্ঞান :
ঘট্‌হি মাহ চৌতরা, ঘটহি মাহ দেওয়ান্।'

অর্থাৎ, কবীরেব বড় ভাল হলো যে, গুরু মিললো যাঁর দ্বারা লাভ হলো জ্ঞান। কারণ তিনি শরীররূপী ঘটের মধ্যে রাজা ও রাজ-সিংহাসন দেখালেন।

'কবীর গুরু গুরুয়া মিলা, বলিয়ায়া ঢলৌয়্‌ন।
জাতি পাঁতি কুল্ মেটিগেই, নাম্ ধবাওয়ে কৌন্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু পাওয়া গেলো। সৎগুরু পাওয়ার জন্যে যেমন বলের দ্বারা ঢেলা চূর্ণ হয়ে যায় তেমনি জাতি, কুল, পাঁতি সব মিটে গেলো। আর কে নাম ধরাবে।

'কবীর জ্ঞান প্রকাশি গুরুমিলে, সোগুরু বিসরি না যায়।
যব্ গোবিন্দ্ দয়া করি, তব্ গুরু মিলি যায়্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যাঁর দ্বারা জ্ঞান প্রকাশ হয় যদি এমন গুরু পাওয়া যায়, তাহলে সে গুরুকে ভোলা যায় না। যখন গোবিন্দ দয়া করবেন তখন আপনা-আপনিই সৎগুরু মিলে যাবে।

'কবীর গুরু গোবিন্দ্ দ্বৌ এক্ হায়্, দুজা হায়্ আকার।
আপাঁ মেটে হরি ভজেই, তব্ পাওয়ে কর্‌তার্।

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরু আর গোবিন্দ দুই এক, কেবল ভেদ

মাত্র। আমি মিটে গেলেই হরিকে ভজন করে তখন লাভ করে কর্তাকে।

'কবীর গুরু গোবিন্দ্ দ্বৌ খাড়ে, কালে লাগোঁ পায়।
বলিহারি গুরু আপ্‌নে, যিন্‌হ গোবিন্দ্ দিয়া লখায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরু আর গোবিন্দ দুই উপস্থিত। এখন আগে কাকে প্রণাম করা যায়? নিজের গুরু যিনি তাঁরই প্রশংসা করি, কারণ তিনিই দেখিয়ে দিয়েছেন গোবিন্দকে।

'কবীর বলিহারি গুরু আপ্‌নে, ঘড়ি ঘড়ি শওবার।
মানুখ্‌তেঁ দেব্‌তা কিয়ো, করৎ না লাগি বার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আপনার গুরুর বলিহারি যাই, কারণ ক্ষণে ক্ষণে ও শত সহস্রবার মানুষ হতে দেবতা করে দেন। এইটি করতে বিলম্ব হয় না।

'কবীর সংশয় খায়া সকল জগ্, সংশয় কোই না খায়।
যো বেধা গুরু অচ্ছর, সো সংশয় চুনি খায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সমস্ত জগৎই সংশয় খেয়ে আছে অর্থাৎ সংশয়ে পড়ে আছে। কিন্তু সংশয়কে খায় না কেউ। যিনি গুরু এবং অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মের ভেদ পেয়েছেন, তিনিই সংশয়কে খুঁটিয়ে খেয়েছেন।

'কবীর বুড়েথে ফেরি উব্‌রে, গুরু কি লহরি চম্‌কি।
বেরা দেখা ঝাঁঝেরা, উতরিকে ভয়ে ফর্‌কি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তিনি তো ডুবে গিয়েছিলেন। কিন্তু গুরুর এক ঢেউ পেয়ে চমক দেখতে দেখতে ফের উঠলেন। একটা ভেলা দেখলেন যা ঝাঁঝরির মতো ছিদ্রযুক্ত, সেই ভেলা হতে নেমে ভয়ে তার তক্তাতে গিয়ে বসলেন।

'কবীর এক নামকে পট্‌তরে, দেবেকোঁ কুছ নাহি।
ক্যালে গুরুহি সম্‌ধিয়ে, হাউস্ রহে মন্ মাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এমন এক নাম হলো তখন দেবার আর

কিছু নেই। কেননা এক হয়েছে তখন আর দেওয়ার কী আছে। কিছু থাকলেই তো দুই হলো। গুরুকে সম্বোধন করবার যে ইচ্ছে তা মনেতেই থেকে গেলো।

'কবীর মন্ দিয়া তিন্ হু॔ সব দিয়া, মন্‌কে সাথ্ শরীর।
আব্ দেবেকোঁ ক্যা রহা, এওঁ কহে দাস কবীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তিনি মনও নিয়েছেন এবং মনের সঙ্গে দিয়েছেন শরীর। তিনি সবই দিয়েছেন, আর দেবার কী আছে এও কবীর বলছেন।

'কবীর শিক্‌লিগর্ কিজিয়ে শব্দ, মস্কলা দেই।
মন্‌কা ময়িল্ ছোড়াইকে, চিৎদরপণ্ করিলেই।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শিক্‌লিগর্ কর (অস্ত্র পরিষ্কারের নাম শিক্‌লিগর্)। অস্ত্র পরিষ্কারের সময় যেমনি একরকম শব্দ হয়, পরিষ্কার হয়ে গেলে অর্থাৎ ময়লা ছুটলে আর শব্দ হয় না। তেমনি মনের ময়লা.পরিষ্কার করে চিত্তকে দর্পণস্বরূপ করো।

'কবীর গুরু ধোবি, শিখ্ কাপ্‌ড়া, সাবন সৃজনি হার।
সুর্‌তী শিলাপব ধোইয়ে, নিক্‌লে জ্যোতি অপার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুই ধোপাস্বরূপ আর শিষ্যই কাপড়ের স্বরূপ অর্থাৎ যেমন কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে গুরু যিনি তিনিও কাপড়স্বরূপ শিষ্যের ময়লা পরিষ্কার করে দেন আর সাবান তাতে দিয়ে অর্থাৎ আত্মার ধ্যান-স্বরূপ শিলাতে বারংবার ধুলে অপার জ্যোতি বেরোয়।

'কবীর ঘর বৈঠে গুরু পায়া, বড়ে হামারে ভাগ।
সেই কো তর্‌সৎ হতে, আব্ অমরৎ আঁচাওন্ লাগ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ঘরে বসে গুরু পেলুম এই আমার বড় ভাগ্য। এমন সময় গেছে যা চেষ্টা করেও অতি সামান্য অকিঞ্চিৎকর পদার্থও পাইনি, কিন্তু এখন অমৃতকেও ছড়িয়ে দিয়েছি।

'কবীর গুরুকো লাল গড়াবোঁ করে, মটিন পকড়ে হেত।
এক খোঁট লাগা রহে, যও লগি লহে না ভেদ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যদি মাটি কারণ না হতো তাহলে আত্মারাম গুরুকে লাল (মণি বিশেষ) গড়িয়ে ফেললুম। যতক্ষণ না ভেদ হচ্ছে (আত্মা একাগ্র হয়ে ব্রহ্মে লীন হচ্ছে) ততক্ষণ একটিতে লেগে থাক।

'কবীর গুরু কো লাল শিখ্‌কু ভঁয়ি, গড়ি গড়ি কাড়ে খোট্‌।
অন্তর হতে সাহার দেই, বাহের বাহের চোট্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরু লালই আছেন। আর শিষ্য তিনি মন্দ হচ্ছেন, কারণ দণ্ডে দণ্ডে কূট তর্ক করছেন অর্থাৎ মন্দ বিষয়েতে রত হচ্ছেন। বাইরে (চোট) আঘাত লাগছে আর ভেতর হতে সাড়া দিচ্ছে।

'কবীর জ্ঞান সমাগম্ প্রেমসুখ্‌, দয়া ভক্তিবিশ্বাস্।
গুরু সেবাতে পাইয়ে, সৎগুরু শব্দ নেবাস্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দয়া, ভক্তি, বিশ্বাস থাকলে সকল জ্ঞান আসে। তাহলেই প্রেমসুখ বা প্রেমানন্দ লাভ হয়। গুরুর সেবা করলে শব্দের ঘর সদ্‌গুরু বলে দেন।

'কবীর গুরু মানুখ্‌ করি জান্তে, তে নর কহিয়ে অন্ধ্‌।
হৈঁ দুঃখী সংসার মে, আগে যমকো বান্দ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুকে যে মানুষ জ্ঞান করে সে মানুষকে অন্ধ বলা যায়। এই সংসারেতে সেই দুঃখী আর পরে যমের বন্ধনে পড়ে।

'কবীর গুরু মানুখ্‌ করি জান্তে, চরণামৃত কো পান্।
তে নর নরক্‌ ছি যাহেঙ্গে, জন্ম জন্ম হোয়ে শোয়ান্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুকে যে মানুষ ভেবে চরণামৃত পান করে, সেই মানুষ যাবে নরকে আর জন্ম জন্ম কুকুরযোনি লাভ করবে।

'কবীর তে নর্ অধ হায়্, গুরু কোঁ কহ্তে আওর।
হরি রুঠে গুরু স্মরণ হায়্, গুরু রুঠে নহি ঠওর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে মন্তব্য গুরুকে গুরু না বলে অন্য কিছু বলে সে অধম। যদি ভগবান হরি রুষ্ট হন, তাহলে গুরুর শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। কিন্তু গুরু যদি রুষ্ট হন, তাহলে আর কোথাও নিস্তার নেই।

'কবীর গুরু মাথেতেঁ উৎরে, শব্দ বিহুনা হোয়।
তাকো কাল ঘসেটি হৈ, রাখি শকে নাহি কোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরু যখন মাথা হতে নেমে পড়লো তখন শব্দশূন্য হয়ে গেল। তাকে কাল (যম) টেনে নিয়ে যান। কেউ রুখতে পারে না।

'কবীর অহং অগ্নি হৃদয় দহে, গুরুতে চাহে মান্।
তিনহকো যম নেওতা দিয়া, তোম্ হোহু মেরে মেজমান্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যার অহংরূপ অগ্নি হৃদয় দাহ করছে আর গুরুর কাছে সম্মান চাচ্ছে, যম তাকে নেমন্তন্ন করেছে এই বলে যে, তুমি আমার প্রিয়পাত্র।

'কবীর গুরু পারশ গুরু পারশ, হায়, গুরু চন্দন সুবাস্।
সৎগুরু পারশ জীউকে, যিন্হো, দিন্হো মুক্তি নেওয়াস্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরু স্পর্শমণিবিশেষ। গুরুই স্পর্শমণি আর গুরুই সুবাসযুক্ত চন্দন। সদ্গুরুই জীবের স্পর্শমণি। কারণ তিনিই মুক্তিনিবাস দেন।

'কবীর গুরু পারশ মে ভেদ্ হায়, বড়ো অন্তরো জান্।
যোহঁ লোহ কাঞ্চন করে, যেএ কঁরিলেই আপু সমান্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুতে আর স্পর্শমণিতে ভেদ আছে। অনেক প্রভেদ আছে জানবে। স্পর্শমণি লোহাকে কেবল কাঞ্চন করে, কিন্তু সৎগুরু যিনি তিনি শিষ্যকে আপনার মতো করে নেন।

'কবীর গুরুকো কিজিয়ে দণ্ডবৎ, কোটি কোটি পর্ণাম্।
জ্যা এসে ভৃঙ্গী কীটকো, কর্লে আপু সমান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুকে দণ্ডবৎ কোটি কোটি প্রণাম করো। ভৃঙ্গী যেমন কীটকে আপনার সমান করে নেয়, তেমনি গুরু যিনি তিনিও শিষ্যকে আপনার মতো করে নেন।

'কবীর গুরুকো তন্ মন্ দিজিয়ে, মুক্তি পদারথ জানি।
গুরু কি সেবা মুক্তি ফল, এহ গিরিহী সহি দানী।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুকে শরীর ও মন অর্পণ করো, এতেই মুক্তি পদার্থ জানবে। গুরুর সেবাই মুক্তিফল। গৃহীই হোক আর দানীই হোক গুরুসেবাই সব।

'কবীর গুরুসোঁ ভেদ যো লিজিয়ে, শির দিজিয়ে দান্।
বহুতক্ অবধূ বহি গ্যায়ে, রাখে জীউ অভিমান্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুর কাছ থেকে ভেদ অর্থাৎ গূঢ় তত্ত্ব যিনি নিয়েছেন, তিনি আগে দিয়েছেন মাথা। এই সংসারসমুদ্রেতে অনেক অবধূত সন্ন্যাসী ভেসে গিয়েছে, যাঁরা রেখেছিলেন আত্মাভিমান।

'কবীর গুরুকো সর্বস্ব দিজিয়ে, আওর পুছিয়ে অর্থা এ।
কহে কবীর পদ্ পর্ সোই, সো হংসা ঘরে ঘাএ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুকে সর্বস্ব দান করে পরমার্থ বিষয় জানো। কবীর বলছেন, তিনি পরম পদ স্পর্শ করে হংস ঘরে যান।

'কবীর গুরুগম্য বতাওয়ে নেহি, শিখ্‌গতে নেহিঁ খুট।
লোক ভেদ্ ভাগে নেহিঁ, সো গুরু কায়ের্ ঠুঁটু।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি শিষ্যকে সৎপথ বলে দিতে না পারেন আর শিষ্য যে-খোঁটা ধরে স্থির হবে তার ভেদ প্রকাশ করতে না পারেন এমন গুরু ঠুঁটোর মতো নিষ্কর্মা।

'কবীর গুরু বতায়েঁ সাধুকো, সাধু কহে গুরু বুঝ্।'
আরশ্ পরশ্‌কে মধিমে, ভই আগম কি সুঝ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরু সাধুকে বলছেন দর্শন স্পর্শন মিলে আগম বোঝা গেলো।

'কবীর গুরু সমান দাতা নাহিঁ, যাচক্ শিখ্ সমান।
তিন লোক্কি সম্প্রদা, সো গুরু দিন্হো দান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুর সমান দাতা নেই, শিষ্যের মতো যাচক নেই। তিন লোকের সম্প্রদা হতে সেই গুরুই সমস্ত দান করেন।

'কবীর পহিলে দাতা শিখ্ ভয়ে, তন্ মন অর্পো শিষ্
পাছে দাতা গুরু ভয়ে, নাম দিয়া বথ্‌শিশ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শিষ্যই হলেন প্রথমে দাতা, কেননা শরীর-মন সবই অর্পণ করলেন গুরুকে। আর পরে গুরু দাতা হলেন, কেননা তিনি শিষ্যকে দিলেন নাম।

॥ গুরু পরীক্ষার বিষয় ॥

সদ্‌গুরু না হলে শিষ্যের গতি নেই। সদ্‌গুরুই বলে দিতে পারেন শিষ্য কীভাবে চলবে না-চলবে। ধর্মপথের যোগ্য পথ-প্রদর্শক হবেন সদ্‌গুরু, নচেৎ শিষ্যের ভাগ্যে সমূহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণও এই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। গুরুকরণ করার আগে শিষ্যের কর্তব্য হবে গুরুকে বাজিয়ে অর্থাৎ পরীক্ষা করে নেওয়া। গুরু করবেন শিষ্যকে পরীক্ষা আর শিষ্যের মনেও অনুসন্ধিৎসা থাকবে গুরুর গুণাগুণ বোঝ্‌বার।

সৎগুরু নির্বাচন প্রসঙ্গে ভক্ত কবীর বলেছেন,—

'কবীর গুরু লোভী শিখ্ লাল্‌চী, দোনো খেলে দাঁও।
দোনো বুড়ে বাপুরে, চড়ি পাথল্ কি নাওঁ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, লোভী গুরু এবং লালসাপরায়ণ শিষ্য দু'জনেই দাঁও মারবার চেষ্টায় আছেন। এরূপ গুরু আর শিষ্য উভয়েই পাথরের নৌকোয় চড়ে ডুবে মরে।

'কবীর যাকো গুরু হায় আঁধরা, চেলা খড়া নিরন্ধ্।
অন্ধে অন্ধে ঠেলিয়া, তুনো কূঁয়া পবন্ত্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যার গুরু অন্ধ এবং শিষ্যও অন্ধ হয়ে খাড়া আছে, এই উভয় অন্ধে ঠেলাঠেলি করে পড়ে গেলো কূয়োয়।

'কবীর জানা নেহি বুঝা নেহি, পুছ্না কিয়া গত্তন্।
অন্ধেকে অন্ধা মিলা, পথ বতাওয়ে কোন্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জানাও নেই, বোঝাও নেই, কাউকে জিজ্ঞেস করাও নেই। অন্ধ ব্যক্তি পথপ্রদর্শক এক অন্ধকে পেলো। সুতরাং কে কাকে পথ দেখায়।

'কবীর ম্যায় মূঢ়ো, উস্ গুরুকি যতেঁ ভরম্ না যায়।
আপনে বুড়া ধার্মে, চেলা দিয়া বাহায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমি তো মূঢ় আর যে গুরু পেয়েছি তাঁরও ঘোচেনি ভ্রম। তিনি নিজে স্রোতে ডুবেছেন ও শিষ্যকেও ভাসালেন।

'কবীর গুরুন্হু ভেদ হায়, গুরুন্হু মে ভাও।
সো গুরু নিশু দিন বদিয়ে, যো শব্দ বতাওয়ে দাঁও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুতেও ভেদ আছে আর গুরুতেও আছে ভাব। এমন গুরুকে সর্বদা বল যিনি প্রাণায়ামাদির দ্বারায় ওঁকার ধ্বনি ইত্যাদি বলে দিতে পারেন।

'কবীর পূরে গুরু বিনা, পূরা শিখ্ না হোয়ে।
গুরু লোভী শিখ্ লালচী, তাতে ঝাঝনি তুনি শোয়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিনা গুরুর সাহায্যে শিষ্য পূর্ণ জ্ঞানবান হয় না। আর গুরু যদি লোভী হন আর শিষ্যও যদি লালসাযুক্ত হয়, তাহলে তু'জনেই দ্বিগুণ মাত্রায় ঘুমিয়ে থাকেন।

'কবীর পূরা সহজে গুণ্ করে, গুণে নওয়ায়ে দেহ।
সায়ের পোখে সর্ভরে, দান ন মাগে মেহ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সহজ ক্রিয়ার গুণ করে গুণের দ্বারা

নোওয়ালেন। আর যাকে সর্বদা লালনপালন করছেন তাকে ঐ গুণের দ্বারা ওপরে লাগিয়ে দিলেন, তখন দান আর প্রার্থনা কে করে। যেমন সমুদ্রে নদীগুলি আপনাআপনি এসে পড়ে আর মেঘ জল দিচ্ছে কিন্তু কারও কাছে কিছু চায় না।

'কবীর পূরা সদ্‌গুরু না মিলা, রাহা অধুরা শিখ।
স্বা গজ্‌ তীকা পরহীকৈ, ঘর্‌ ঘর্‌ মাঙ্গে ভিখ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরুতো মিললো না, সুতরাং শিষ্যেরও চঞ্চলত্ব গেলো না। মনও হাতির মতো বেঁকে থাকার জন্যে আসক্তিবশত ঘরঘর ভিক্ষে চাইতে লাগলেন।

'কবীর পূরা সদ্‌গুরু না মিলা, রাহা অধুরা শিখ্‌।
নিক্‌সাথা হরিভজন কো, বঝি গ্যায়ে মায়া বিক্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু তো মিললো না আর শিষ্যের চঞ্চলত্ব গেলো না। হরিভজনের জন্যে বাইরে এসেছিলো, কিন্তু ফের মায়ায় আবদ্ধ হলো।

'কবীর গুরু কি বাহার দেহকা, সদ্‌গুরু চিন্‌হা নাহি।
ভৌ সাগর কো জাল্‌মে, ফিরি ফিরি গোতা খাই।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরু তো দেহকেই জ্ঞান করেছি। কিন্তু সৎগুরু তো চিনি না, একারণ ভবসাগরের জলেতে বদ্ধ হয়ে ধাক্কা খাচ্ছি।

'কবীর যোহি গুরুতে ভয় না মেটে, ভ্রান্তি মন্‌ কি না যায়।
গুরুতো য্যয়সা চাহিয়ে, যো দেই ব্রহ্ম দর্‌শায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে-গুরুতে ভয় না যায় এবং মনের ভ্রান্তি ও সংশয় না যায়, সে গুরু চাই না। এমন গুরু চাই, যিনি ব্রহ্মদর্শন করিয়ে দিতে পারেন।

'কবীর কাণ্‌ ফুকা গুরু হদ্দকা, বেহদ্দকা গুরু আওর।
বেহদ্দকা গুরু যব্‌ মিলে, তও লহে ঠিকানা ঠাওর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কাণফুঁকা গুরুর হদ্দ আছে অর্থাৎ যাঁরা

কাণে মন্ত্র দিয়েই ক্ষান্ত হন। আর বেহদ্দ গুরু অন্যরকম অর্থাৎ যখন বেহদ্দ গুরু (অসীম শক্তিমান গুরু) পাওয়া যাবে, তখন ব্রহ্মের ঠিকানা পাওয়া যাবে।

'কবীর জানে গুরুকোঁ বুঝিয়া, প্যায়ড়া দিয়া বতায়।
চল্‌তা চল্‌তা তাঁহা গিয়া, যাঁহা নিরঞ্জন রায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুতো বুঝেই বলেছেন পথ। এখন চলতে চলতে সেখানে গেলুম যেখানে নিরঞ্জন রায় (ভগবান) আছেন।

'কবীর বন্দে কো বন্ধা মিলা, ছুটে কোনি উপায়
করু সেওয়া নির্ব্বন্ধকি, পল্‌মে লেই ছোড়ায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আবদ্ধ ব্যক্তি পুনরায় বন্ধনমুক্ত হলো। পালাবার কোনো উপায় নেই। নির্বন্ধ তাঁর সেবা করো, তাহলে তিনি এক পলের মধ্যে বন্ধনমুক্ত করে দেবেন।

'কবীর যাকা গুরু হায় গৃহী, চেলা গৃহী হোয়।
কিচ্‌ কিচ্‌ কে ধোঁয়ে, দাগ্‌ না ছুটে কোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যার গুরু গৃহী অর্থাৎ যিনি আসক্তির সঙ্গে সংসারাশ্রমে ভ্রমণ করেন তিনিই গৃহী, তাঁর শিষ্যও গৃহী হয়। কেবল জলে ধুলে দাগ যায় না।

'কবীর গুরু নাম হায় গম্যকা, শিখ্‌ শিখিলে সোয়।
বিনু সংঘৎ মর্য্যাদ্‌বিনু, গুরু শিখ্‌ না হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি গম্য স্থান না জানেন তিনি নামেমাত্র গুরু। বিনা সঙ্গতে না শিখলে ও বিনা মর্যাদাতে না থাকলে গুরুর মতো শিষ্য হয় না।

'কবীর গুরু আতো সস্তে ভয়ে, কৌড়িকে, রপচাশ্‌।
আপনে তন্‌কি শুধ্‌ নাহি, শিখ্‌ করন কি আশ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরু এতোই সস্তা হয়েছেন যে, এক কুড়াতে পঞ্চাশ জনকে পাওয়া যায়। নিজের শরীরের শুদ্ধি হয় নি অথচ শিষ্য করবার বাসনা।

'কবীর যো নিহং অচ্ছর পাইয়া, তাকা মেটিকা দোয়।
সো গুরু পূরা কহিয়ে, কদিহি গৃহী না হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এমন এক অহঙ্কারশূন্য অক্ষর পেলেন তাইতেই তাঁর দ্বন্দ্ব গেলো মিটে অর্থাৎ দুই আর রইলো না। এরূপ গুরুকে বলা যায় পূর্ণ। ইনি গৃহী হলেও কখনো গৃহী নন।

'কবীর ঝুঁটে গুরু কি পাচ্ছ্ কোঁ, ত্যজৎ ন কিজে বার।
দওয়ার না পাওয়ে শব্দকা, ভর্মে ভও জলধার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মিথ্যে গুরুর পক্ষ ত্যাগ করতে দেরি করো না। তা না করলে ওঁকার ধ্বনির দরজা পাবে না, আর ভ্রমজালে প'ড়ে ভবসাগরে পড়ে থাকবে।

॥ সৎগুরুর অংশ বর্ণনা ॥

'কবীর সদ্‌গুরু সম্ কৈ সঙ্গ্ নেহি, সাধু সম্ নাহি জাতি।
হরি সমানে নাহি হিত কৈ, হরি জন সম্ নাহি পাঁতি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরুর সঙ্গের মতো আর সঙ্গ নেই, সাধুর সমান জাতিও নেই আর হরির মতো হিতকারী আর নেই। আর যাঁরা হরিতে সর্বদা থাকেন তাঁদের মতো আর কোনো সমাজ নেই।

'কবীর সদ্‌গুরুকি মহিমা অনন্ত্ হায়, অনন্ত্ কিয়া উপকার্।
লোচন অনন্ত, উধারিয়া দেখব নেহার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরুর মহিমা অপার। সে মহিমা বর্ণনা করা যায় না। তাঁর দ্বারায় জীব অনন্ত উপকার পেয়ে থাকে। চক্ষুও অনন্ত আর ঐ অলৌকিক চক্ষু দিয়ে উদ্ধার করিয়ে দেন অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়ে দেন।

'কবীর সব্ জগ্ ভরমৎ ইয়োঁ ফিরে, যয়োঁ জঙ্গল্‌কা বোঝ।
সদ্‌গুরু সে শোধি ভেই, পায়া হরিকা খোঁজ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সমস্ত জগৎ ভ্রমে পড়ে এমনভাবে ফিরছে যেন জঙ্গলের বোঝা অর্থাৎ ঔষধাদি চেনে না অথচ জঙ্গলে ঔষধের জন্যে ঘুরছে। যখন সদ্গুরুর দ্বারা শোধিত হবে অর্থাৎ জানবে, তখন পাবে হরির সন্ধান।

'কবীর আতি পাই থির্ ভয়ো, সদ্গুরু দিন্হা ধীর।
মাণিক হীরা বণিজিয়া, মান সরোবর্ তীর্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্থিরের স্থান লাভ করে হলুম স্থির—যা দেখিয়ে দিয়েছেন সদ্গুরু আর মাণিক ও হীরার ব্যাপারী হয়ে মানস-সরোবরের কিনারা পেয়েছি।

'কবীর থিত পাই মন্ থির ভয়া, সদ্গুরু করি সহায়।
অনন্ত কথা জীও উচরৈ, হিদ্য়া রমিতা রায়।

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, চঞ্চল মন স্থিরকে পেয়ে স্থির হলো কিন্তু তাহলো সৎগুরুর সাহায্যেই। আর এই জীব উচ্চারণ করতে লাগলেন অনন্ত কথা, কারণ যিনি হৃদয়ে রমণ করেন তাঁকে লাভ করেছেন।

'কবীর চেতন্ চৌউকী বইঠী কৈ, সদ্গুরু দিনহু ধীর।
নির্ভয়ে হোয়ে নিঃশঙ্ক ভজো, কেবল কহে কবীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, চৈতন্যরূপ চৌকীতে বসে যা ধীর সৎগুরু দিয়েছেন, তা নির্ভয়ে শঙ্কাশূন্য হয়ে ভজন করো।

'কবীর বহে বাহানে যাৎথে, লোক বেদ কি সাথ্।
বীচ্হি সদ্গুরু মিলি গ্যায়ে, দীপক্ দিন্হো হাথ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তিনি লোকাচার এবং বেদপুরাণাদির সঙ্গে স্রোতে বয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই সৎগুরু পাওয়া গেলো। তাতেই তিনি প্রদীপ হাতে দিলেন অর্থাৎ প্রদীপের আলো পেয়ে সব চিনে নিলেন।

'কবীর দীপক্ দিন্হা লভবি, বাতী দই অঘট্।
পূরা কি আওয়ে সাহ না, বহুরিনা চেরি অহট্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রদীপ তো দিলেন কিন্তু সলতে ঘটে না থাকায় সফল হলো না। স্বামী এসে যখন পূর্ণরূপ করে দিলেন, তখন খুব জ্যোতিই দেখলেন কিন্তু তারপর আর দেখতে পেলেন না। ফের তার চেষ্টা করলেন। কিছুই হলো না।

'কবীর সদ্‌গুরু নিধি মিলাইয়া, সদ্‌গুরু সাহু সুধীর।
নিপ্‌ যেমে সাঝি ঘনে, বাঁটন্‌ হার কবীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু যিনি তিনি নিধিস্বরূপ রত্ন মিলিয়ে দিলেন। সৎগুরুই মহাজন ও সুবুদ্ধিশালী। যে-সব অংশীদার ছিলো তাদেরকে কবীর ঐ নিধি বণ্টন করে দিচ্ছেন।

'কবীর সৎ হাঁম্‌ সো রিঝিকেই, এক কহা পর্‌ সঙ্গ্‌।
বাদর্‌ বরিষা প্রেমকা, ভিজি গেয়া সব্‌ অঙ্গ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎ যিনি তিনি তো আমায় সন্তুষ্ট করলেন আর এক সঙ্গের কথাও বললেন। তাতে এমন প্রেম জন্মাল যে, সেই প্রেমরূপ বৃষ্টির জলে ভিজে গেলো আমার সর্বাঙ্গ।

'কবীর চৌপর্‌ মাড়ি চৌহটে, সারি কিয়া শরীর্‌।
সদ্‌গুরু দাঁও বাতাইয়ে, খেলে দাস কবীর্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শরীরের চারদিকে বল চালিয়ে পাশা চালাতে লাগলেন। সদ্‌গুরু যিনি তিনি দান বলে দিচ্ছেন আর খেলছেন কবীর।

'কবীর সদ্‌গুরুকে সদ্‌কে কিয়া, দিল্‌ আপ্‌নেকা সাব্‌।
কল্‌ যুগ্‌ হাঁম্‌সে লড়ি পড়া, মোহকুম মেরা বাচ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু যিনি তিনি ভালো করেন যদি মন-প্রাণ তাঁকে আপনা-আপনি অর্পণ করা যায়। কিন্তু কিরূপে তা হবে, কলিযুগ আমার সঙ্গে লড়াই করছে, এটা আমার, ও জায়গা আমার, এ আমার হুকুম, এ আমার কথা শুনতেই হবে—এতেই হয় না।

'কবীর সদ্‌গুরু সাচা সুরীয়া, শব্‌দ যো বাহা এক্‌।
লাগাৎ হি ভয়ি মেটি গেয়ি, পরা কলেজে ছেক।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু যথার্থ সুর। তাতে এক ওঁকার ধ্বনি হচ্ছে। তাতেই সব ভয় মিটে গেলো আর প্রাণও তখন স্থির হলো।

'কবীর সদ্‌গুরু শব্‌দ কমান্‌ লেয়ি, বাঁহন লাগে তীর।
এক যো বাহা প্রীতি করি, বেধা সকল্‌ শরীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু শব্দের ধনু নিয়ে চালাতে লাগলেন বাণ অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করতে লাগলেন। একবার যখন ভক্তিসহযোগে ছাড়লেন বাণ, তখনি হলো সর্বশরীর বিদ্ধ।

'কবীর সদ্‌গুরু মারা বাণ্‌ ভরি, ধরি কৈ সুধী মুঠি।
অঙ্গ উঘারে লাগিয়া গয়া দুভাষা ফুটি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু বাণ ভরে মারলেন। বেশ মনোযোগ-পূর্বক মুটি ধরে তা খালি গায়ে লেগে কেটে গেলো দ্বৈতভাব।

'কবীর হংসে ন বোলে উন্মনী, চচঁল মৈলা মারী।
কহে কবীর অন্তর বেধা, সদ্‌গুরুকা হাতিয়ারি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হংস উন্মনী প্রাপ্ত হলে আর কথা বলতে ইচ্ছা করেন না। তখন চলমান বস্তুগুলি চলে যায়, কারণ সৎগুরুর অস্ত্রের দ্বারায় সব ভেদ করে এক করলো, এইটিই বলছেন কবীর।

'কবীর গুঙা হুয়া বাউরা, বহিরা হুয়া কাণ্‌।
পাওন্থেতে পঙ্গুলা হুয়া, সদ্‌গুরু মারা বাণ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু এমন বাণ মেরেছেন যে, কথা বলার ইচ্ছে নেই, যেন পাগল। শোনবার ইচ্ছে আছে অথচ কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, পা আছে অথচ পঙ্গুর মতো চলতে ইচ্ছে করে না।

'কবীর গুরু মেরা শূরুয়াঁ, বেধা সকল্‌ শরীর।
বাণ্‌ দুভাষা ছুটি গেয়া, কেঁও জীয়ে দাস কবীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমার গুরু যিনি তিনি শূর, বাণেতে সকল শরীর বিদ্ধ করেছেন। তাতেই ছুটে গেছে দ্বৈতভাব, এখন কেমন করে কবীর দাস আর বাঁচেন।

'কবীর সদ্‌গুরু সাঁচা শূরিয়া, নখশিখ্ মায়া পূর।
বাহার্ ধাওয়ান্ দিশই, ভিতর চাক্‌না চূর্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরুই যথার্থ শূর। তিনি আপাদমস্তক পূরে মারলেন। তাতে বাইরে চলছে দেখছে কিন্তু ভেতরে সব চূর্ণ হয়ে গেছে অর্থাৎ স্থির হয়ে গেছে।

'কবীর সদ্‌গুরু মারা বাণ্ ভরি, টুটি গেয়ি সব জেব্।
কহি আশা কহি আপদা, কহি তস্‌বি কহি কিতেব্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু বাণ মেরেছেন, তাতেই সব ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু এর আগে কখনো আশা করতো, কখনো বা কোনো কাজ করে বিপদগ্রস্ত হতো, কখনো বা মালাজপ করতো, কখনো বা পুস্তকাদি শাস্ত্রপাঠ করে প্রকৃত অর্থ জানতে না পেরে সংশয় জাগতো।

'কবীর সদ্‌গুরু মারা জ্ঞান করি, শব্দ সুরঙ্গে বাণ্।
মেরা মায়া ফিরি জীউয়ে, তো হাথ্ন গহি কামান্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু ওঁকার ধ্বনির শব্দ যেখান হতে আসছে সেই স্থান নিশ্চয় করে বাণ মারলেন, তাতে আমাকে মারলেন অর্থাৎ অহং ইত্যাকার জ্ঞান নষ্ট করলেন, কিন্তু আবার যদি বাঁচে তাহলে আর ধনুক ধরবো না।

'কবীর সদ্‌গুরু মারা বাণ্, নিরখি নিরখি নিজ্ ঠাওর্।
রাম অখিলমে রমি রাহা, চেৎ নহি আওয়ে আওর্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু নিজেকে দেখতে দেখতে বাণ ভরে মারছেন আর যখন দেখছেন, আত্মারাম সর্বত্র রমণ করছেন তখন আর চিত্তেতে কিছুই আসছে না।

'কবীর সদ্‌গুরু ওয়াহি প্রীতি করি, রহি কাটারি টুটি।
য্যায়্‌সি অনি নসালই, ত্যায়্‌সি ছালই মুটি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু যাতে প্রীতিলাভ করেছেন, তাতে মেশবার অস্ত্র কাটারি তা ভেঙ্গে বয়ে গেলো। যেমন অংশেতে তাতে স্থির বইলো, তেমনিভাবেই মুষ্টিধারণ হলো।

'কবীর মান্ বড়াই উরুমে, এই জগকো ব্যবহার্।
দাস গরিবি বন্দ্গি, সদ্গুরু কো উপকার্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মান-সম্ভ্রম আত্মশ্লাঘা এসব জগতের রীতি। আর নম্রতা, শীলতা ও যাতে সকলের ভালো হয় অর্থাৎ যাতে সকলে নিজের ধর্ম অবলম্বন করে তার চেষ্টা, এই-ই সৎগুরুর উপকার।

'কবীর দিলহি মাহো দীদার হায়, বাদ বকে সংসার।
সদ্গুরু শব্দ কাম সকলা, যিসে ওয়ার হি পার্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মনের মধ্যেই সব রয়েছে কিন্তু সংসারী লোকে বৃথা বকে মরছে। যখন সৎগুরুর দ্বারায় ওঁকার ধ্বনি শুনতে লাগলো, তখন এপার-ওপার সব দেখলো।

'কবীর যো দিশে সোই বিনুশে, নাম ধরা সো যায়।
কহে কবীর সোই তত্ত্ব গহে, যো সদ্গুরু দেইবতায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যাকিছু দৃশ্যমান পদার্থ দেখছো তা সবই বিনাশশীল। যার নাম ধরবে সেই যাবে অর্থাৎ যা ব্যক্ত করা যায় তার বিনাশ আছে। কবীর বলছেন, সেই তত্ত্ব নাও যা বলে দিয়েছেন সৎগুরু।

'কবীর কুদরৎ পায়ি খবর্ সোঁ, সদ্গুরু দয়ি বতায়্।
ভোঁর বিলম বা কৌলমে, অব্ক্যায়সেঁ উড়ি যায়্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরুর কৃপায় তিনি এমন এক শক্তির খবর পেলেন যে, মন তাতেই সবসময় আবদ্ধ হয়ে আছে। সে আর কীভাবে উড়ে যাবে। এ সেই মাতাল ভ্রমরের পদ্মের মধু-পানের মতো। ভ্রমর পদ্মের মধুপান করতে গিয়ে পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করে ও মধুপানে উন্মত্ত হয়ে যায়। এদিকে দিনমণি গেলেন অস্ত,

পদ্মের মুখও হয়ে গেলো বন্ধ, সুতরাং ভ্রমরের আর উড়ে যাবার পথ হয়ে গেলো বন্ধ।

'কবীর রামনাম ছাড়োঁ নহি, সদ্‌গুরু শিখ্ দেয়ি।
অবিনাশী সো পরশ্ করি, আত্মা অমর ভেয়ি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কখনো রামনাম ত্যাগ করো না—যে রামনাম শিখিয়ে দিয়েছেন সৎগুরু। অবিনাশীকে স্পর্শ করলেই অমর হবে আত্মা।

'কবীর চৌষটি দীয়া যো এ করি, চৌদহ চন্দাঁ মাহি।
তেহি ঘর্ ক্যায়সা চন্দাঁ, যোহি ঘর্ সদ্‌গুরু নাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, চৌষট্টি দীপ জোগাড় করলুম আর চতুর্দশ চন্দ্রও মধ্যে রইলো। কিন্তু এতো আলো সত্ত্বেও যে ঘরে সৎগুরু নেই, সে ঘর কীভাবে আলোকিত করবে।

'কবীর কোটি এক চন্দাঁ উগহিঁ, সূরয্ কোটি হাজার্।
কহে কবীর সদ্‌গুরু বিনা, দিশৈ ঘোর আন্ধার্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কোটি চাঁদ উঠেছে ও হাজার কোটি সূর্য উদয় হয়েছে। কবীর বলছেন, সৎগুরু ছাড়া এতো আলো সত্ত্বেও দশদিক আঁধার।

'কবীর সদ্‌গুরু মোহি নেওয়া জীয়া, দিনহু সু অমর বোল্।
শীতল ছায়া সঘন্ ফল্, হংসা কর্‌হি কলোল্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু আমাকে সুন্দর অমর বাক্য দিয়ে রক্ষা করলেন আর তাতে শীতল ছায়ারূপ পরিপক্ক ফল লাভ হলো। হংস যিনি তিনি কল্লোল করতে লাগলেন।

'কবীর সদ্‌গুরু সৎ কবীর হায়্, সংকট পরেঁ হুজুর।
চুকা সেওবা বন্দেগি, কিয়া চাকরী দূর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরুই কবীর হচ্ছেন, কারণ সকল বিপদ নিবারণ করে রেখেছেন। আর যদি সেবা না করো অর্থাৎ সাধন না করো, তাহলে চাকরি হতে দূর করে দেবেন।

'কবীর চিৎ চোক্কে মন্ উজ্‌লে, দয়াবন্ত গম্ভীর।
সেই ধোকে বিচলে নাহি, যেহি সদ্‌গুরু মিলেঁ কবীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মন নির্মল ও উজ্জ্বল হলে দয়াবান ও গম্ভীর হয় তখন কিছুতেই বিচলিত হয় না, যিনি সৎগুরু কবীরকে পেয়েছেন।

'কবীর জ্ঞান সমাগম্ প্রেম সুখ্, দয়া ভক্তি বিশ্বাস্।
সদ্‌গুরু মিলি এক্ ভয়া, রহি ন তুজি আশ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জ্ঞান হলে প্রেমানন্দ হয়, দয়া, ভক্তি, বিশ্বাস হয়। তখন সৎগুরুর সঙ্গে মিলে এক হয়ে যাওয়ার আর কোনো আশাই রইলো না।

'কবীর সদ্‌গুরু পারশ্ কো শিলা, দেখ তত্ত্ব বিচারি।
আহি পরোশিনি লে চলি, দিয়া দিয়া সো বারি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরুই পরশ পাথর, এই তত্ত্ব বিচার করে দেখো। এই রূপ স্পর্শের দ্বারা নিয়ে চলেন—যেমন একটা দীপ অন্য দীপ জ্বেলে নেয়।

'কবীর সদ্‌গুরু গমি যো কহি দিয়া, ভেদ্ দিয়া আর বায়্।
সুরতি কওয়ল্‌কে অন্তরিচ্, নিরাধর্ পদ্ পায়্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু যা জেনে বলেছেন অর্থের সঙ্গে ভেদও বলেছেন। পূর্ণ কমলের মধ্যে অর্থাৎ সহস্রারের মধ্যে নিরাবলম্বন পদ পায়।

'কবীর জীব অক্ষম বহু কুটীল হায়, কোই নহি গতি আইয়ে।
তাকো অয়গুণ্ মেটী কায়, সদ্‌গুরু হংস বনায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জীব অক্ষম ও বড় বক্র বুদ্ধি। কিছুই তার খবরে আসে না। এমন লোকের সমস্ত দোষ সংশোধন করে সদ্‌গুরু বানিয়ে দেন হংস।

'কবীর সদ্‌গুরু বড়ে সরাক্ হায়, পরখে খরাও খোট্।
ভও সাগর্‌তে কাড়িকে, রাখে আপ্‌নে ওট্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু বড় পরীক্ষক। দোষগুণ বিচার করে ভবসাগর হতে কেড়ে নিজের আশ্রমে রাখেন।

'কবীর সদ্‌গুরু শব্দ জাহাজ্‌ হায়, কৈ কৈ পাওয়ে ভেদ্‌।
সমুদ্র বুন্দ্‌ একৈ ভয়া, কাকো করো নিখেদ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু যিনি তিনি ওঁকার ধ্বনির জাহাজ বিশেষ। কেউ কেউ তার ভেদ পায়। সমুদ্র আর বিন্দু যখন একই হয়ে গেলো তখন কে কাকে নিবারণ করে।

'কবীর সদ্‌গুরু মহল্‌ বনাইয়া, জ্ঞান্‌ গিলাওয়া দিন্‌হ।
দূরী দেখন্‌ কে কারণে, শব্দ্‌ ঝরোকা কিন্‌হ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু যিনি তিনি একটি মহল তৈরী করিয়ে জ্ঞান গিলিয়ে দিচ্ছেন আর দূরের বস্তু দেখার জন্যে ওঁকার ধ্বনি শোনবার একটি জানলা কিনেছেন।

'কবীর সদ্‌গুরু বচন্‌ মানে নাহি, আপ্‌নি সম্‌ঝে নাহি।
কহে কবীর ক্যা কিজিয়ে, কিয়ো বিথা জীও মাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরুর বাক্য মানে না, আপনি বোঝে না এমন লোককে কবীর বলছেন, বৃথা মানুষের জীবন ধারণ করে কি করছে।

'কবীর সদ্‌গুরু বাপুরা ক্যা করে, যো শিখ্‌হি মোহায় চুক্‌।
কোটি যতন্‌ প্রমোধিয়ে বাঁশ বাজাওয়ে ফুক্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু বেচারী আর কি করবেন যদি শিষ্যের মধ্যে ভুল থাকে। কোটি যত্ন করে বুঝলেও বুঝবে না, খালি বাঁশেই ফুঁ দিয়ে বাজাবে।

'কবীর সদ্‌গুরু মিলা তো ক্যা ভয়া, যো মন্‌ পরিয়া ভোল্‌।
পাশ্‌ বীণা ঢাঁকা পরা, ক্যা করে বাপুরা ঢোল্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যার ভোলা মন তার সৎগুরু মিললেই বা কি হবে। বীণাযন্ত্র পাশেই ঢাকা রয়েছে, সে ঢাকা বেচারীর বা কি দোষ?

'কবীর সদ্‌গুরু কো সারা নহি, শব্দ ন বেধা অঙ্গ্‌।
কোরা রহি গেয়া সিধরা, শাদা তেল্‌কে সঙ্গ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু যা বলেছেন তা সার করে নি, কাজেই ওঁকার ধ্বনিও কবীরে প্রবেশ করে নি, যেমন তেমনিই থেকে গেলো, তেলের সঙ্গে থেকেও শাদা রইলো, রং ধরলো না।

॥ স্মরণ করার অঙ্গ ॥

'কবীর দণ্ডবৎ গোবিন্দ গুরু, অবজন্‌ বন্দো সোয়ে।
পহিলে ভয়ে পর্‌ণাম্‌ তেহি, ম্যোজো আগে হোয়ে।'

অর্থাৎ কবীর বলছেন, গোবিন্দ গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও বন্দনা আর করেন না। প্রথমেই তাঁকে প্রণাম করতেন কিন্তু এখন আপনা-আপনি কোনো কাজের দ্বারায় প্রণাম করে 'ম্যোজা' (এক অবস্থা বিশেষ গুরু উপদেশগম্য) হয়ে রয়েছেন।

'কবীর জ্ঞান কথে বকি বকি মরে, কাহে করে উপাধি।
সদ্‌গুরু হাম্‌সে এঁও কহা, সুমিরণ্‌ কর সমাধি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জ্ঞানের কথা নিয়ে বকে মরছে, কেবল মান আর উপাধির জন্যে। কিন্তু সৎগুরু আমাকে এই বলেছেন, স্মরণরূপ সমাধি কর (স্মরণ—গুরু উপদেশগম্য) সাধারণে যেভাবে স্মরণ করে তা নয়, সাধনসাপেক্ষ।

'কবীর নিজ সুখ্‌ রাম হায়, দুজা দুঃখ অপার্‌।
মনসা বাচা কর্ম্মণা, কবীর সুমিরণ্‌ সার্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, নিজের সুখ রাম হচ্ছেন, আর দুই যে ভাবে তার অপার দুঃখ। মানসিক বাচনিক ও কর্মের দ্বারায় যা করা যায়, কবীর বলছেন এর সারই স্মরণ।

'কবীর সুমিরণ্‌ সার্‌ হায়, আওর্‌ সকল জঞ্জাল্‌।
আদি অন্ত্‌ সভ্‌ মোধিয়া, দুজা দেখা কাল।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্মরণই সার হচ্ছে, আর সব জঞ্জাল। আদি অন্ত সমস্তর মধ্যে দ্বিতীয় কাল দেখলো।

'কবীর সুমিরণ্ কিয়া তব্ জানিয়ে, তন্ মন্ রহা সমায়।
আদি অন্ত মধ্য এক্ রস্, ভুলা কবিহি না যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্মরণ করলে তখন জানবে যে শরীর ও মন ছিলো, কিন্তু এক জায়গায় প্রবেশ করেছিলো তাতে আদি অন্ত মধ্য কিছুরই ঠিক করতে পারা গেলো না—এক রস অর্থাৎ এক ভাব সে-ভাব আর কখনো ভোলা যায় না, যে একবার পেয়েছে।

'কবীর আদি অন্ত্ মধ্য ভুলিয়া, পছ্ তাওয়া মন্ মাহি।
কহেঁ কবীর হরি সুমিরণ্, ওহোতো কিয়া নাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আদি অন্ত মধ্য ভুলে মনের মধ্যে অনুতাপ হচ্ছে। কবীর বলেন, যে হরির স্মরণ ওতো করি নি (কবীর বলছেন, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আদি, অন্ত, মধ্য সবই ভুলে-ছিলুম। মনে মনে অনুতাপ করছিলুম যে, আত্মারাম গুরু স্মরণ করছিলুম না)।

'কবীর সুমিরণ্ থোর্ হি ভালা, যৌ করি জানে কোয়।
স্যুৎ ন লাগি বন্‌ওয়ানি, সহজে সভ্ সুখ্ হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে কোরে জেনেছে তার পক্ষে স্মরণ কমও ভালো। সুতো তৈরী করতে যেসব জিনিস লাগে ও যতো কষ্ট হয়, সহজরূপ সুতো পাকাতে হলে কোনো জিনিসের দরকারও হয় না, কোনো কষ্টও হয় না, সমস্ত সুখই হয়ে থাকে।

'কবীর জীওবন্ তো থোর্ হি ভালা, হরিকা সুমিরণ্ হোয়্।
লাক্ বরিস্ কি জীউনা, লেখা ধরে না কোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হরিকে স্মরণ করে অল্প দিন বাঁচাও ভালো। তা না করে লক্ষ বছর বেঁচে থাকাও কেউ গণ্য করে না।

'কবীর দুখমে সুমিরণ্ সভ্ করে, সুখমে করে না কোয়।
যো সুখ্‌মে সুমিরণ্ করে, তো কাহেকোঁ দুখ হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দুঃখেতে সকলেই স্মরণ করে সুখেতে কেউ স্মরণ করে না। যে সুখেতে স্মরণ করে, তার দুঃখ আর কেন হবে।

'কবীর সুখ্‌মে সুমিরণ্‌ না কিয়া, দুঃখ্‌মে কিয়া যো ইয়াদ্।
কহেঁ কবীর তা দাস্ কি, কেঁও লাগে ফিরিয়াদ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সুখের সময় স্মরণ করে নি। দুঃখে পড়ে যে মনে করেছে, কবীরদাস তাঁকে বলেন কেমন করে তার নালিশ চলবে।

'কবীর সুমিরণ্‌ কি সুধি এয়োঁ কয়ো, য্যায়সে কামী কাম্।
কহে কবীর ফুকারি ক্যায়, খুসী হোহিঁ তব্‌ রাম্।'

অর্থাৎ, কামী ব্যক্তি কাম্য বস্তুর প্রতি যেমনভাবে স্মরণ করে, তুমি ঠিক তেমনিভাবে স্মরণ করো। কবীর উচ্চৈস্বরে বলছেন, ওমনি করলেই রাম হবেন খুশী।

'কবীর সুমিরণ্‌ কি সুধি এয়োঁ করো, যেঁও গাগরি পাণিহারী।
বোলে ভোলে সুত্তিমে, কহহিঁ কবীর বিচারি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যেমন স্ত্রীলোকেরা জলের কলসী মাথায় নিয়ে হেলেদুলে চলছে, কথাও বলছে অথচ মাথায় কলসী যেমন তেমনিই আছে, পড়ছে না। কারণ তার মন কলসীতেই আছে। তেমনি স্মরণও এমনিভাবে করা চাই, এইটিই কবীর বলেছেন বিচার করে।

'কবীর্ সুমিরন্ কি সুধি এয়োঁ কয়ো, যেঁও সুরভি সুত্‌ চাহি।
কহহিঁ কবীর চরাচরি, সুরভী বাচ্ছুকে পাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্মরণ এমনভাবে করো যেমন গাভী বাচ্ছার দিকে সর্বদাই চেয়ে আছে অথচ ঘাসও খাচ্ছে, চোরেও বেড়াচ্ছে কিন্তু তার মন বাচ্ছার কাছেই রয়েছে। এমনিভাবে মনকে রাখার জন্যে কবীর বলছেন।

'কবীর সুমিরণ্‌ কি সুধি এয়োঁ করো, য্যায়সে দান কাঙ্গাল।
কহহিঁ কবীর বিসরই নহি, পল্ পল্ লেই সভল্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এমনভাবে স্মরণ করো যেমন দাতা ও কাঙাল।

কবীর বলছেন, কাঙালব্যক্তি মুহুর্মুহু দান পাবার জন্য স্মরণ করে, কিছুতেই ভোলে না। স্মরণও তেমনিভাবে করা চাই।

'কবীর সুমিরণ্ মন্ লাগৈ নাহি, জগ্‌সোঁ সমিটা যায়।
কহহি কবীর শুন সাধুয়া, তাকা কাঁহা উপায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্মরণ করতে মন লাগেই না। জগতের দৃশ্যমান পদার্থে লেগে থাকে মন। কবীর বলেন, হে সাধু। তার উপায় কি ?

'কবীর সুমিরণ্ সেঁ মন্ যব্ লাগৈ, জগ্‌সোঁ হোয়ে নিরাশ্।
কায়াকো সুখ্ ছোড়ি কেয়্, জগ্‌সোঁ হোয়ে উদাস্।'

অর্থাৎ কবীর বলছেন, স্মরণ করতে মন যখন লাগে তখন জগৎ হতে মন নিরাশ হয়। শরীরের সুখ ছেড়ে দিয়ে জগৎ হতে উদাস হয়।

'কবীর সুমিরণ্ মন্ লাগে নাহি, বিখে হলাহল্ খায়।
কবীর হাটকানা রহে্, করি করি থকে উপায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্মরণ করতে তো মন লাগে না। সুখ হবে মনে করে বিষয়রূপ বিষ পান করে। কবীর বলছেন, ঐ বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে আবার করবো করবো মনে করে, কিন্তু করেও না অথচ কোন উপায়ও দেখতে পায় না।

'কবীর সুমিরণ্ সো মন্ যব্ লাগে, জ্ঞান অঙ্কুশ দে শিষ্।
কহেঁহি কবীর ডোলে নেহিঁ, নিশ্চয় বিশ্বাস।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যখন স্মরণেতে মন লাগে তখন জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ মাথায় দৃঢ়রূপে বিদ্ধ হয়, এইটিই বলছেন কবীর।

'কবীর সুমিরণ সোঁতি সব্ ভালা ঘর্ বন সবহিঁ ঠাওঁ।
কহেঁ কবীর সুমিরণ্ বিনা, নেহ ভল্ বন্ নহিঁ গাঁও।

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্মরণ করলে সবই ভাল, ঘর-বন সবই সমান। কবীর বলছেন, বিনা স্মরণেতে বন ও গ্রাম কিছুই ভালো নয়।

'কবীর সুমিরণ্ সোঁ সিদ্ধি হোৎহায়, সুমিরণ সোঁ রিদ্ধি হোয়।
সুমিরণ্ সাঁই মিলে, করি দেখ সভ্ কোয়্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্মরণের দ্বারা সিদ্ধি হয়, রিদ্ধিও হয়। রিদ্ধি —অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। স্মরণে যিনি কর্ত্তা তাঁকেও পাওয়া যায়, এইটি সকলে করে দেখুন।

'কবীর সুমিরণ্ সোঁ সুখ্ হোৎহায়, সুমিরণ্ সেঁা দুখ্ যায়।
কহে কবীর সুমিরণ্ ফিরে সাঁই মাহ সমায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্মরণেতে করে সুখ হয় ও দুঃখ যায়। কবীর বলেন, স্মরণ করলে প্রবেশ লাভ করা যায় কর্তার মধ্যে।

'কবীর সুমিরণ্ সোঁ সংশয় মেটে, সুমিরণ, সোঁ মেটে শোগ্।
কহে কবীর সুমিরণ্ কিয়ে, রহে না একো রোগ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্মরণে সংশয় দূর হয়। স্মরণে দূর হয় শোক। কবীর বলছেন, স্মরণ করলে কোনো রোগও থাকে না।

'কবীর সুমিরণ্ মাহি রামকে, ঢিল্ না কিজিয়ে নন্।
কহে কবীর ছন্ এক্ মো, বিনশী যায়েগা তন।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামের স্মরণ করতে আলস্য করো না। কারণ এক মুহূর্তের মধ্যে এই শরীর নষ্ট হতে পারে, এইটিই বলছেন কবীর।

'কবীর সুমিরণ্ করে সো শান্ত জন্ অহির্নিশি অপনে জাগি।
কহে কবীর সুমিরণ্ ত্যজে, তাকো বড় অভাগি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শান্ত ব্যক্তিরাই দিবারাত্রি জেগে স্মরণ করছেন। কবীর বলছেন, সেই ব্যক্তিই বড় অভাগা, যে স্মরণ ত্যাগ করে।

'কবীর সুমিরণ্ সম কুছ হায় নেহি, যোগ যজ্ঞব্রৎ দান।
সুমিরণ্ সম্ তীরথ্ নেহি, সুমিরণ্ সম নাহি জ্ঞান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যোগ বলো, যজ্ঞ বলো, দান বলো, ব্রত

বলো, স্মরণের তুল্য আর কিছুই নেই, আর স্মরণের তুল্য তীর্থও নেই ; জ্ঞানও স্মরণের তুল্য নেই।

'কবীর জপ্ তপ্ সঞ্জম্ সাধন্, সব্ সুমিরণ কো মাহি।
কহে কবীর বিচারি, কৈ সুমিরণ্ সম্ কুছ নাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জপ, তপ্ সংযম, সাধন এ-সমস্তই স্মরণের মধ্যেই আছে। কবীর বিচার করে বলছেন, স্মরণের তুল্য আর কিছুই নেই।

'কবীর সহকামী সুমিরণ্কা করেই, পাওয়ে উচা ধাম্।
নিহ কামী সুমিরণ্ করে, পাওয়ে অবিচল্ রাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কামনার সঙ্গে যে-ব্যক্তি স্মরণ করে সে স্বর্গ পায়। নিষ্কাম হয়ে স্মরণ করলে অবিচল রাম অর্থাৎ স্থিরত্ব পদ লাভ করে।

'কবীর সহকামী সুমিবণ্ করে, ফিরি আওয়ে ফিরি যায়।
নিহ কামী সুমিরণ্ করে আওয়া গমন্ নশায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কামনার সঙ্গে যে-স্মরণ করে সে ফিরে আসে আর যায়। নিষ্কামভাবে স্মরণ করলে আসা-যাওয়া রহিত হয়।

'কবীর রাজা রাণা ন বড়া, বড়া যে সুমিরে রাম।
তাহি মো সো জন্ বড়া, যো সুমিরে নিহকাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাজাও বড় নন, রাণীও বড় নন। যে রামকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তিই বড় আর তাদের মধ্যে সেই জনই শ্রেষ্ঠ যে নিষ্কামভাবে স্মরণ করে।

'কবীর সাহেবকা সুমিরণ্ করেই, তাকো বন্দো দেও।
পহিলে আয়ে ডিগাবই, পাছে লাগে সেও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি রামকে স্মরণ করেন তাঁকে দেবতারাও বন্দনা করেন। প্রথমে এসে ঠকাবার চেষ্টা করেন, পরে করেন সেবা।

'কবীর সুমিরণ্ সুরতি লাগাইকে, মুখ সো কছুওন বোল্।
বাহের কে পট্ দেই কেই, অন্দর কো পট্ খোল্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যখন স্মরণ লেগেছে তখন আর কথা বলবার ইচ্ছে নেই। মুখের দ্বারা কোন কিছু বলো না। বাইরের পরদা ফেলে দিয়ে অন্দরের পরদা খুলে দাও।

'কবীর যো বোলে তো রাম্ কহি, আওরেহি রাম কাহাওয়ে।
যা মুখ্ রাম না নিক্‌লেই, তা মুখ ফেরি কাহায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে যা-কিছু বলছে তা তো রামই বলছেন আর রামই বলাচ্ছেন। আর যার মুখ হতে রাম না বেরুলো সে মুখ মুখই নয়।

'কবীর মুখ তো সোই ভলা, যা মুখ নিক্‌লেই রাম।
যা মুখ্ রাম না নিকলেই, সো মুখ কোনে কাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ঐ মুখই ভালো যে-মুখ হতে রামনাম উচ্চারণ হচ্ছে। আর যে মুখে রামনাম উচ্চারণ হয় না, সে মুখেব দরকার কি?

'কবীর হরি কা নাম্ মে, সুর্‌তি রহে এক তার্।
তা মুখ্‌তে মতি ঝরে, হীরা অনন্ত অপার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হরির নাম করে এক হয়ে থাকেন। সেই মুখ হতে বেরোয় মতি। আর হীরকাদি মণি অনন্ত পরিমাণে মেলে।

'কবীর হরি কে নাম্ মে, বাৎ চালাওয়ে আওর্।
তিস্ অপরাধী জীউকো, তিনি লোক নেহি ঠাওর্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে-ব্যক্তি হরির নামেতে অন্য কথা বলে অর্থাৎ মন্দ কথা বলে, সেরূপ অপরাধী ব্যক্তির তিন লোকেতেও নিস্তার নেই।

'কবীর রতন্ সুমিরণী রাম্ কি, পোয় মন্ মস্তুল্।
ছবি লাগি নিরখৎ রহে, মিট গেয়া সংশয় শূল্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামচন্দ্রের রত্নস্বরূপ মালা মন গেঁথেছেন। এরূপ অবস্থার একটি ছবি দেখে তা দেখতে লাগলেন। তাতেই মিটে গেলো সংশয়রূপ শূল।

'কবীর মেরি সুমিরণী রাম্‌কি, রসনা উপর রাম।
আদি যুগাধি ভক্তি জে, সবকো নিজ্‌ বিশ্রাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমার রাম নামের মালার যে সুমেরু তা রসনার ওপরে আছেন। তিনিই আদি ও যুগাধি এবং তাঁতেই থাকলে জন্মায় ভক্তি। সকলের বিশ্রামস্থানও সেখানে।

'কবীর রাম নাম্‌ সুমিরণ করে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্‌।
কহেহিঁ কবীর সুমিরণ্‌ করে, নারদ্‌ শুকদেব্‌ শেষ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাম নামের স্মরণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ এঁরাও করছেন। কবীরও স্মরণ করছেন আর স্মরণ করছেন নারদাদি ঋষিগণ।

'কবীর সনকাদি সুমিরণ্‌ করে, নাম ধ্রুব প্রহ্লাদ।
জন্‌ কবীর সুমিরণ্‌ করে, ছোড়ি সকল্‌ বক্‌বয়াৎ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সনকাদি ঋষিরাও স্মরণ করছেন, ধ্রুব-প্রহ্লাদও স্মরণ করছেন। সমস্ত বকাবকি ছেড়ে ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিরা নাম করেন ভগবানের।

'কবীর রাম্‌ নামকে সুমিরতে, জ্বরে পতিৎ অনেক্‌।
কহে কবীর নেহি ছোড়িয়ে, রাম্‌ নামকি টেক।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাম নামের স্মরণ করলে যারা পতিত নীচ প্রকৃতির লোক তারা জ্বলে মরে ও নানারকমে কথা বলে। তাদের কথায় রামনাম কখনো ত্যাগ করো না।

'কবীর রাম নামকে সুমির্‌তে, অধম্‌ তরে সংসার।
অজামিল্‌ গণিকা সুপচ্‌, সেওরি সদন চণ্ডার্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাম নামের স্মরণ করলে অধম ব্যক্তিও সংসারসমুদ্র হতে তরে যান। অজামিল প্রভৃতি অনেক নীচ লোক তরে গেছেন।

'কবীর রাম নাম্‌ মন্‌ লাইলে, য্যায়সে পাণি মীন।
প্রাণ ত্যজে পল্‌ বিছুরে, দাস্‌ কবীর কহি দীন।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জলের মাছের মতো রামনামেতে মন রাখো। মাছ যেমন জলছাড়া এক দণ্ড স্থির থাকে না। রামনামই তার সবকিছু। তেমনি কবীর বিনয় করে বলছেন, রামনামে তোমার মন লেগে থাক।

'কবীর রাম্ নাম্ মন লাইলে, য্যায়সে নাদ্ কুরঙ্গ।
কহে কবীর টরে নেহি, প্রাণ ত্যজে তেহি সঙ্গ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাম নামেতে এমন মন লাগাও যেমন নাদ ও মৃগ—অর্থাৎ ব্যাধেরা যখন হরিণ শিকার করতে অরণ্যে যায়, তারা আগে অরণ্যে গিয়ে বাঁশী বাজাতে থাকে। হরিণ সে বংশীধ্বনি শুনতে বড় ভালবাসে। বংশীধ্বনি শুনে ক্রমশ ব্যাধের নিকটবর্তী হয়। তখন ব্যাধেরা জালের দ্বারায় তাকে করে বদ্ধ। কবীর বলছেন, হরিণ প্রাণত্যাগ করে, তবু সেখান থেকে নড়ে না। বাঁশীর ধ্বনির সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করে।

'কবীর রামনাম মন লাইলে, য্যায়সে কীট্ ভৃঙ্গ্।
কবীর বিসরাওরে আব্কো, হোয়ে যায় তেহি রঙ্গ্।'

অর্থাৎ কবীর বলছেন, রাম নামেতে মন এমনি লাগাও যেমন কাঁচপোকা ও কীট। কবীর বলছেন, কীট আপনাকে ভুলে ভৃঙ্গেরি রং হয়ে যায় অর্থাৎ কীট কাঁচপোকার রং দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে ভুলে যায়। রাম নামেতে কীটের মতো মন লাগালে জীবও হয়ে ওঠে শিব।

'কবীর রাম নাম্ মন্ লাইলে, য্যায়সে দীপ্ পতঙ্গ্।
প্রাণত্যজে ছন এক্ মো, জ্বরত না মোড়ে অঙ্গ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনামেতে মন এমনি লাগিয়ে রাখো যেমন দীপ আর পতঙ্গ। পতঙ্গ জ্বলন্ত প্রদীপে পড়ে এক মুহূর্তের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু একবারও ছট্ফট্ করে না।

'কবীর রাম কহে সভ্ রহিৎ হায়, তন্ মন্ ধন্ সংসার।
রাম কহে বিন্ বাৎ হায়, লাক চৌরাশী ধার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনাম বললে শরীর, মন, ধন, সংসাব এ-সবই চলে যায়। রাম নাম না বললে চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে হয়।

'কবীর রাম নাম রুচি উপ্‌জে, জীউ কি জ্বলনি বুঝায়ে।
কহে কবীর এক রাম নাম বিন্নু, জীউকে দাহ্ না যায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনামের রুচি হলে জীবের সকল জ্বালা শীতল হয়। কবীর বলছেন, এক রামনাম ছাড়া জীবের কোনো জ্বালা যায় না অর্থাৎ রামনাম না করলে সব জ্বালাই থাকে।

'কবীর রাম রিঝাঁইলে, জিহ্বাসো করু মৎ।
হরি সাগর নহি বিসরেই, নর্‌ দেখি অনন্ত্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামকে খালি জিবের দ্বারায় সন্তুষ্ট করো না অর্থাৎ খালি কথায় করো না। হরিরূপ সমুদ্র সর্বদা মনে রাখবে। কখনো ভুলবে না। যখন এমনি হবে তখন নর অনন্ত দেখবে।

'কবীর রাম রিঝাঁহলে বিখ্‌ অমৃৎ বিল্‌ গায়।
ফুটা নগ্‌ যো জোড়িয়ে, সয়িহি সন্ধ মিলায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামকে সন্তুষ্ট করলে বিষ অমৃতের গুণে এক হয়ে যায় অর্থাৎ অমৃত হয়ে যায়। যেমন কোন একটা জিনিস ভেঙ্গে দুটুকরো হলে তাকে আঁবার জুড়তে হলে উভয়ের সন্ধিতে সন্ধিতে মেলালে এক হয় তেমনি।

'কবীর রাম জগৎ কুষ্টী ভালা, চুঁই চুঁই পর্‌তা চাম।
কাঞ্চন দেহ কেহি কাম্‌ কি, যা মুখ্‌ নাহি রাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গলিত কুষ্ঠগ্রস্তও ভালো যদি রামনাম জপ করে। আর যে মুখে রামনাম বেরোয় না, সে সবল কান্তিবিশিষ্ট হলেও কোন কাজের নয়।

'কবীর রাম জগৎ দালিদ্রি ভালা, টুটি ঘর্‌ কি ছান্‌।
কাঞ্চন্‌ মন্দিল্‌ খান্‌ দে, যাঁহা ভক্তি নহি জ্ঞান্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দরিদ্রও ভালো যদি রামনাম জপ করে,

রামনাম জপ করে ভাঙ্গা ঘর ভালো, কিন্তু যেখানে ভক্তি ও জ্ঞান নেই সে স্থান স্বর্ণমন্দির হলেও কিছু নয়।

'কবীর টাট্ ওড়িকে হরি ভজে, তাকা নাম্ সপুৎ।
মায়া এয়ারি মখারা, কেতে গেয়ে কপুৎ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, চট্ গায়ে দিয়েও যদি হরির ভজন করে সেই সুপুত্র আর মায়াতে আবদ্ধ হয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে অনেক কুপুত্র গত হয়েছে।

'কবীর সব্ জগ্ নির্ধনা, ধনবন্ত নেহি কোয়ে।
ধনবন্তা সোই জানিয়া, যাকে রাম নাম ধন্ হোয়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সমস্ত জগতই নির্ধন, কেউই ধনবন্ত নেই। ধনবন্ত তাঁকেই জানবে যাঁর কাছে রামনাম আছে।

'কবীর যাকি গাঁঠি রাম হায়, তাসো হায় সবসিদ্ধ্।
করযোড়ে ঠাড়ি পরেই, আট্ সিদ্ধ নও নিধ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যাঁর সঙ্গে রামনাম আছে তাঁর সব সিদ্ধিই আছে। আর অষ্টসিদ্ধি ও নবনিধি যোড়হস্তে তাঁর কাছে উপস্থিত থাকে।

'কবীর পরগট্ রাম কহু, ছানে রাম ন গায়ে।
কুস্‌কো ডোরা দূ'রি করু, যো বহুরি ন লাগায়ে গায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনাম প্রকাশ করে বলো তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু ভেতরের রামের বাধা না জন্মায়। কুশের দড়ি দূর করো কারণ তা আর ফিরে লাগে না অর্থাৎ মুখের রামনাম কোন কাজের নয়।

'কবীর বাহার কাঁহা দেখ্ লাইয়ে, অন্তর্ কহিয়ে রাম।
কহো মহউলা খলক্ সো, পরা ধনীসে কাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, অন্তরে রাম বলো, বাইরে দেখাচ্ছো কেন সম্ভ্রম? এখানকার বড়তে কি প্রয়োজন? যাঁর তুলনায় আর ধনী নেই তাঁকেই দরকার।

'কবীর নাম বিসারো দেহকো, জীও দশা সব্ যায়ে।
যব্হিঁ ছোড়ে নাম্ কো, তব্হি লাগে ধায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দেহের নাম ভুললেই জীবের সব দশা যায়। আবার যখন রামনাম ভুলে যায় তখন আবার সব দশা এসে লেগে যায়।

'কবীর রামনাম নহি ছোড়িয়ে, এহ পরতীত দিড়্ বাঁধি।
কাল্ কল্প ব্যাপে নহি, ডোরি নাম্ কি সাধি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনাম কখনো ছেড়ো না। বেশ দৃঢ় করে বেঁধে রাখো। কারণ কালের হাত এড়াতে পারবে না। দড়িরূপী নামের সাধন করো, তাহলে পার হবে।

'কবীর রাম হমারে মাত হায়, রাম হমারে তাত্।
রাম হমারে মিত্র হায়, রাম হমারে ভ্রাত্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামই আমার মা, রামই আমার বাপ। রামই আমার বন্ধু, রামই আমার ভাই।

'কবীর রাম হমারে আশ্রম, রাম হমারে বরণ্।
রাম হমারে জাতি হায়, রহিহি রামকে শরণ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামই আমার আশ্রম, রামই আমার বর্ণ। রাম আমার জাতি আর রামেরই শরণাপন্ন হয়েছি।

'কবীর রাম হমারে মোহনী, রাম হমারে শিখ্।
রাম হমারে ইষ্ট্ হায়, রাম হমারে রিখ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামই আমার মোহিনীস্বরূপ আর রামই আমার শিষ্য। রামই আমার ইষ্টদেবতা, রামই আমার ঋষি।

'কবীর রাম হমারে মন্ত্র হায়, রাম হমারে তন্ত্র্।
রাম হমারে ঔষধি, রাম হমারে যন্ত্র।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাম আমার মন্ত্রস্বরূপ, রাম আমার তন্ত্রস্বরূপ। রাম আমার ঔষধিস্বরূপ, রাম আমার যন্ত্রস্বরূপ।

'কবীর রাম হমারে ভূমীয়াঁ, রাম হমারে দেও।
রাম হমারে সাধ্‌ হায়, কর্‌হি তিন্‌হি কি সেও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাম আমার আধারস্বরূপ, রামই আমার দেবতা। সাধনও আমার রাম, তাঁরই সেবা করি।

'কবীর তীরথ্‌ হমারে রাম হায়, বরত্‌ হমারে রাম।
দান্‌ হমারে রাম হায়, নেহি আওর সো কাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাম আমার তীর্থ, রাম আমার ব্রত। রাম আমার দান, রাম ছাড়া কোন কাজ করি না।

'কবীর মোতি চুনি রাম হায়, হরি হীবা ও লাল্‌।
রূপা সোনা রাম হায়, ভোজন্‌ সাজন্‌ মাল্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মতি ও চুনি আমার রাম। হরি হীরা ও লাল (মূল্যবান পাথর বিশেষ)। রূপো, সোনা এও আমার রাম। ভোজন, সাজন, আনন্দ সবই আমার রাম।

'কবীর সোনা রূপা কাল্‌ হায়, কঙ্কর্‌ পাথর হীর্‌।
এক্‌ নাম মুক্তা মণি, তাকো জপহি কবীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সোনারূপোই কাল। হীরে, কাঁকর, পাথর আর এক নামই আমার মুক্তোমণি। কবীর জপ করেন তাঁকেই।

'কবীর যব্‌ হি রাম হৃদয় আন্ধার, ভয়ে পাপ্‌ কো নাশ।
মানুখ্‌ চিনিগি আগ্‌কো, পড়ি পুরাণে ঘাস্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যখন হৃদয়েতে উদয় হন রাম তখন সমস্ত ভয় ও পাপ নাশ হয়ে যায়, যেমন পুরোনো ঘাসের ওপর একটু আগুন পড়লে জ্বলে ওঠে তেমনি।

'কবীর রাম যো রতি এক হায়, পাপ্‌ যো রতি হাজার্‌।
অরয রাই ঘট্‌ সঞ্চরে, জ্বারি করে সব্‌ ছার্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামের ইচ্ছে এক আর পাপের ইচ্ছে হাজার। যখন রাম ঘটেতে সঞ্চার হবে, তখন সব ইচ্ছেকে পুড়িয়ে দূর করে দেন।

'কবীর পহিলে বুরা কমাইকে, বান্ধে বিক্ষিপট্।
কোটি করম্ কাটে পলক্ মে, যব্ আওয়ে হরি ওট্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আগে অনেক কুকর্ম করে বিষের পুঁটলি বেঁধে রেখেছি। কিন্তু যখন হরি এসে নিজের আড়ালে রাখবেন, তখনকোটি কর্মও এক পলের মধ্যে কেটে যাবে।

'কবীর কোটি কর্ম কাটে পলক্ মে, যঁও রঞ্চক আওয়ে নাম্।
অনেক্ জন্ম যও পুণি করে, নেহি নাম্ বিন্ ঠাঁও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কোটি কর্মও কেটে যাবে, যখন অচল অবস্থা নাম আসবে। অনেক জন্মও যদি পুণ্য কর তাতে কিছু হবে না। নামছাড়া গতি নেই।

'কবীর যিন্ যিন্ য্যায়সা হরি জানিয়া, তিন্কো ত্যায়সা লাভ্।
য়োসে বাসন্ ভাজই, যও লাগি-ধসে ন য়াও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি যেরূপ হরিকে জানেন তার সেইরূপই লাভ। যেমন বাসনে ঘা দিলে ভেঙ্গে যায়, তেমনি হরিকে জোরে ভক্তির সঙ্গে ভজন করলে হরি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে শরীর ভেঙ্গে দিয়ে বিদেহ মুক্তি দেন।

'কবীর হরিকো সুমিরি লে, প্রাণ যায়ে গা ছুটি।
ঘর্কে পচারে আদমী, চলৎ লেহি গে লুটি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সর্বদা হরিকে স্মরণ কর, এ না করলে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ঘরের পাশেই রয়েছে লোক, চলতে গেলেই লুটে নেবে।

'কবীর লুট্ শকে তো লুট্লে, রাম নাম হায় লুটি।
ফেরি পাছে পছ্তাওগে, প্রাণ যাহিগে ছুটি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাম নাম পড়ে রয়েছে। যত লুটতে পারো লুটে নাও। কেননা প্রাণ বেরিয়ে গেলে শেষকালে আপ্সোস করতে হবে।

'কবীর লুটিশকে তো লুট্লে, রাম নাম হায় লুটি।
নাম নগ্নিকে গহো, নাতো যায়েগা ছুটি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনামের লুট পড়ে রয়েছে। যত লুটে নিতে পার নাও। অমূল্য রত্ন যত্ন করে ধরে রাখো, কি জানি যদি ছুটে যায়।

'কবীর লুটি শকে তো লুটিলে, রামনাম্ ভণ্ডার্।
কাল্ কণ্ঠ্ তব্ গহহিগে, রোকেঁ দশো দুয়ার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনামের ভাণ্ডার রয়েছে যত লুটে নিতে পারো লুটে নাও। আর দশ দ্বার বন্ধ করে কালকে কণ্ঠে স্থির করে রাখো।

'কবীর রামনাম্ জপি লিযিয়ে, ছোড়ি জীউ কি বাণি।
পরিশ্‌মে বিতি গেই, সোই, আপু পব্ জানি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সাধারণ জীবের কথা ত্যাগ করে রামনাম জপ করে নাও। বৃথা সময় নষ্ট হয়ে গেলো, এমন নিজের ও পরবুদ্ধি জেনে নিয়েছি।

'কবীর রামনাম্ নিধি লিযিয়ে, ত্যজি মায়া বিখ্ বোজ্
বার্ বার্ নেহি পাইয়ে, মানুখ্ জনম্ কি মোজ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মায়ার স্বরূপ বিষের বোঝা ত্যাগ করে নিধিস্বরূপ রামনাম গ্রহণ করো, কারণ এমন মনুষ্য জন্মের মজা বারবার পাবে না।

'কবীর রামনাম্ জপি লিযিয়ে, যব্ লগি দিয়া বাতি।
তেল্ ঘাটে বাতি বুঝেই, তব্ শোগ্রা দিন্‌রাতি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনাম জপ করে নাও কারণ প্রদীপের সলতে আসছে শুকিয়ে। তেল ফুরুলেই বাতি নিভবে। তখন সবদিনই বোধ হবে রাতের মতো।

'কবীর শুতা কেয়া করে, জাগি না জপেই মুরারী।
এক্ দিন্‌ভি ছোড়না, লম্বে পাও পসারি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শুয়ে কি করো? একদিন তো পা ছড়িয়ে শুতেই হবে, অতএব জেগে জপ করো, করো হরিনাম।

'কবীর শুতা কেয়া করে, উঠি কেঁও না রোয়ে দুখ্।
যাকা বাসা গোর্‌মে, সো কেঁও শোয়ে সুখ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শুয়ে কি করছো? যার বাসা গোরের মধ্যে সে শুয়ে কি সুখে আছে? কেননা উঠে কাঁদে ও দুঃখ করে।

'কবীর শুতা কেঁয়া করে, গুন্ গোবিন্দ কা গাও।
তেরে শির্ পর্ যম্ খাড়া, খরচ্ দেই কেয়া খাও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে যম সে কিভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছে। সে গোবিন্দের গুণ গান করুক। যা খরচ পেয়েছিলে তা কি খেলে?

'কবীর শুতা কেয়া করে, শুতে হোয় অকাজ্।
ব্রহ্মাকো আসন্ তিগা, শোয়ৎ কাল্ কি লাজ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শুয়ে কি করছো, শুলে কোনো কাজ হয় না। ব্রহ্মারও আসন টলে যায়। শুলেই কাল এসে গ্রাস করে।

'কবীর শুতা কেয়া করে, কাহে না দেখই জাগি।
যাকে সঙ্গ সো বিছুরা, তাহিকে সঙ্গ্ লাগি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শুয়ে কি করছো, জেগে দেখো। যার সঙ্গে ছিলে তাকে ছেড়ে দিলে আবার তারই সঙ্গে লেগে থাকো।

'কবীর নিদ্ নিশানি নীচ্ কি, উঠ কবিরা জাগি।
আওর্ রসায়ন্ ছোড়্‌কে, তোম্ রাম রসায়ন্ লাগি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, নিদ্রা নীচ লোকেরই চিহ্ন। কবীর জেগে ওঠো আর সামান্য ধাতুর রসায়ন ছেড়ে আত্মারামের বসায়ন করো।

'কবীর আপ্‌নে পাহরে জাগিয়ে, রহিয়ে নেহি শোয়ে।
না জানো ছিন্ এক মো, কেস্‌কা পাহারা হোওয়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, নিজের পাহারায় জেগে থাকো। ঘুমিয়ে থেকো না। কি জানি এক মুহূর্তের মধ্যে আবার কার পাহারা হবে।

'কবীর শোয়া সো নিফল্ গেয়া, জাগে সো ফল লেই।
সাহেব হক্ না রাখেই, যব মাঙ্গে তব্ দেই।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শুলেই বিফলে যায় আর জেগে থাকলেই ফললাভ হয়। যিনি মালিক তিনি হক্ পাওনা রাখেন না, চাইলেই দেন।

'কবীর কেসো কহি কহি কুহুকিয়ে, শোইয়েনা পাও পসারি।
রাতি দিও সফা কুহু কনা, কবুহু কে লাগে গোহারি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কাকেই বা বারেবারে বলি, কি করছো? পা ছড়িয়ে শুয়ো না, দিনরাত কাজ করো, কখন কে ডাকবে তার ঠিক নেই।

'কবীর য্যায়সে মন মায়া রমে, ত্যাসে রাম রমায়ে।
তারা মণ্ডল্ ছোড়িকে, যাঁহা কে সো তাঁহা যায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মন যেমন রমণ করে মায়াতে, তেমনি যদি আত্মারামেতে রমণ করে ও তারামণ্ডল সব ছেড়ে দেয় তাহলে যেখান হতে এসেছিলে সেখানেই যাবে।

'কবীর জাগৎ শোয়ৎ রাম কহু, পরে উতানে রাম।
উঠৎ বৈঠৎ রাম কহু, পাওৎ অঁচোয়ৎ রাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জাগ্রত অবস্থায়, নিদ্রিত অবস্থায়, ওঠা-বসার সময়, ভোজনে, আঁচাবার সময় সর্বদাই বলো রামনাম।

'কবীর ক্ষুধা কালি কুকুরী, করে ভজন্ মে ভঙ্গ।
ওয়াকো টুকুরা ডারিকে, সুমিরণ্ করো নিঃশঙ্ক।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জীবের ক্ষুধারূপী কাল কুকুরী অর্থাৎ ইচ্ছে সে সাধনের সময় বিঘ্ন করে, বাধা দেয়। এই কারণে তাকে কিছু খেতে দিয়ে নির্ভয়ে স্মরণ করো।

'কবীর গৃহীকা টুকরা অপচ্ হায়, তাকে লম্বে দাঁৎ।
ভজন্ করে তো উবরে, নহি তো কারে আঁৎ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গেরস্তের অন্ন অপাক হয়, পরিপাক হয় না। কারণ তার লম্বা দাঁত আছে অর্থাৎ গেরস্ত লোক নানারকম পাপ কাজ করে অর্থ উপায় করছে। সেই অর্থের দ্বারা ক্রয় করে আহার্য দ্রব্য। সেইজন্যে বদ্‌হজম হয়। যদি সাধনা করে তাহলে উঠে যায় নতুবা কেটে দেয় নাড়ী।

'কবীর গিরিহী কেরি মধুকরী, খাই রহে যো সোই।
কহেঁ কবীর সুমিরণ্ বিনা, অন্ত দুহেলি হোই।'

অর্থাৎ, কবীব বলছেন, মধুকরীর মতো গেরস্তের বাড়ী হতে অন্ন ভিক্ষে করে খেয়ে বেড়ায়। সে যদি স্মবণ আত্মমনন না করে তাহলে অন্নদাতা ও গৃহীতার অন্ত দুয়ে নেয় অর্থাৎ সঞ্চিত পুণ্য বলপূর্বক দুয়ে নেয়।

'কবীর গোবিন্দ্‌কে গুণ্ গাওতে, কভু না কিযিয়ে লাজ্।
আব্ পদবী আগে মুক্তি, এক্ পন্থ দুই কাজ্।'

অর্থাৎ, কবীব বলছেন, গোবিন্দের গুণগান করতে কখনো লজ্জা করো না। প্রথমে তো ভালোই হবে আর মুক্তিও হবে। এক বিষয়ে দুই কাজ লাভ হবে।

'কবীর গুণ্ গায়ে গুণ্‌হা কাটে, রটে রাম বিয়োগ।
অহিনিশি হরি ধ্যাওয়ে নহি, মিলে না দুর্লভ যোগ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হরিগুণ গাইলে কেটে যায় আগুন। তাহলে আর রাম বিয়োগ প্রকাশ হয় না। কিন্তু আহর্নিশি হরিকে ধ্যান না করলে দুর্লভ যে যোগ তা পাবে কোথা থেকে?

'কবীর কঠিনাই খরি, যো সুমরেই হরি নাম্।
শূলি উপর্ খেলনা, গিরেই তো নাহি ঠাম্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি হরিনাম স্মরণ করেন তাঁর পক্ষে কিছু কঠিন সত্য, কেননা শূলের ওপর খেলা করতে হলে সতর্কতা প্রয়োজন নচেৎ পড়লেই নিস্তার নেই।

'কবীর লম্বা মারগ্ দূরি ঘর্, বিকট্ পন্থ বহু ভার।
কহে কবীর কেঁও পাইয়ে, দুর্লভ হরি দিদার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, একে তো রাস্তা লম্বা তাতে আবার ঘরও অনেক দূরে আছে। রাস্তায় অনেক ভয়ও আছে আর আছে ভারী বোঝা। কবীর বলছেন, এমন অবস্থায় দয়াময় দুর্লভ হরিকে পাবে কেমন করে?

'কবীর হরিকে মিলন্ কি, বাৎ শুনি হাম্ দোয়ে।
কি কছু হরিকা নাম্‌লে, কি কর উচা হোয়ে।'

অর্থাৎ কবীর বলছেন, আমি হরি মিলনের দু'টি কথা শুনেছি। তার মধ্যে একটি হরিনাম করলে পাওয়া যায় অপরটি ওপরে থাকলে হয়।

'কবীর আঁখ্‌ড়িয়াঁ ঝাঁইপড়ি, পন্থ নিহারি নিহারি।
জিভরি আঁছালা পড়ে, রাম পুকারি পুকারি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাস্তা দেখতে দেখতে চোখেতে দিশে লেগে গেছে অর্থাৎ কিছুই ভালো দেখতে পাচ্ছি না আর রাম রাম বলে উচ্চৈস্বরে চীৎকার করতে করতে জিবেতে পড়লো ফেনা।

'কবীর নয়নহুনে ঝরি লইয়া, রংহট্ বহে নিশি যাম।
পপিহা যেঁও পিয়া পিয়া করে, কব্‌রে মিলেঙ্গে রাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পাপিয়ারা যেমন দিবারাত্র 'পিয়া! পিয়া!' করে অর্থাৎ হে স্বামি! তোমায় কবে পাব! এমনি দিনরাত চীৎকার করতে করতে চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তেমনি ডাক্ ডাকো।

'কবীর চিন্ত চিন্‌গি উড়িয়া, চহুদিশ্ লাগি লাইয়ে।
হরি সুমিরণ হাথে ঘড়া, বেগ্‌হি লহু বুঝায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, চিন্তাস্বরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারদিকে লেগে উড়ছে। হরি স্মরণরূপ জলপূর্ণ ঘড়া হাতে করে চিন্তাস্বরূপ আগুন নিবিয়ে ফেলো।

'কবীর চিন্তা তো হরি নাম কি, অওর ন চিংওয়ে দাস।
যো কিছু চিংওয়ে নাম বিন্নু, সোই কাল্ কি ফাঁস।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হরিনামের চিন্তাই চিন্তা, অন্য চিন্তা কোন কাজের নয়। যাকিছু নামছাড়া চিন্তা করবে তাই কালের ফাঁসী।

'কবীর স্বপনে মে বর্ বরাইকে, জোবে কহেগা রাম।
ওয়াকে পগ্ কি পৈতরি, মেরে তনকো চাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি স্বপনেতে ও জোরে রামনাম বলে ওঠেন, তাঁর পায়ের তলা আমার গায়ের চামড়া জানবে।

'কবীর নিমিখি নিমিবান্থ কিযিয়ে, উর্ অন্তর সো রাম।
কহহি কবীরা রামকহু, সকল্ সঁওয়ারে কাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, নির্মিষবর্জিত করে ভেতরে-বাইরে রাম দেখো। কবীব বলছেন, এমনি কবলে তোমার সকল কামনা পূর্ণ করে দেবেন।

'কবীর ভজন্ করে ত ভজে, গুণ্ ইন্দ্রি চিৎ চোর।
সর্ পন্থ চন্দন্ পরিহরি, যব্ চড়ি বোলে মোর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সকলেই ভজন কবে ও ভজেও সকলে, কিন্তু গুণ ও ইন্দ্রিয় চিত্তকে চুরি করে রেখেছে এই কারণে চিত্তরূপী ভগবানকে দেখা যাচ্ছে না। কর্মের দ্বারায় দেখা যায় যেমন সাপ চন্দন গাছ আশ্রয় করলে তাড়াতাড়ি ত্যাগ করে না, কিন্তু যখন ময়ূর এসে ডাকতে থাকে তখন চন্দনগাছ ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। তেমনি ময়ূররূপী ভগবান এলে গুণ ও ইন্দ্রিয়সকল যায় পালিয়ে।

'কবীর শ্বাস সুফল্ সোই জানিয়ে, হরি কা সুমিরণ্ লায়ে।
আওর শ্বাস এহুঁ গয়া, করি করি বহুৎ উপয়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সেই শ্বাসই সুফল জানবে যে-শ্বাস হরি স্মরণেতে লেগে যায় আর অনেক উপায় করেও অন্য শ্বাসগুলি গেলো বৃথা।

'কবীর যাকি পূঁজি শ্বাস হায়, ছিন্ আওয়ে ছিন্ যায়ে।
তাকো য়্যাসা চাহিয়ে, রহে রাম লোলায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যাদের সম্বলই শ্বাস আর কিছুই পুঁজি নেই—একমাত্র শ্বাস ভরসাস্থল, সেতো আবার এক ক্ষণকালের জন্যে স্থির নেই। একবার যায় ও আসে। এমন অবস্থায় লোকের উচিৎ সর্বদা আত্মারামকে নিয়ে মজে থাকা।

'কবীর কাঁহা ভরোসা দেহকো, বিনশী যায়ে সিন মাহি।
শ্বাস শ্বাস সুমিরণ্ করে, আওর উপায় কছু নাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দেহের আবার ভরসা কোথায়? এক ক্ষণকালের মধ্যে যে নাশ হয়ে যায়, আর কিছুই উপায় দেখছি না। এইটি রক্ষা করার একমাত্র উপায় প্রত্যেক শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ করা।

'কবীর অজপা সুমিরণ ঘট্ বীচে, দিনহো শিরিশিরি জনিহার।
তাহি সো মন্ লাইলে, কহহিঁ কবীর বিচার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, অজপা (জীব সর্বদা এই মন্ত্র জপ করছে) এর স্মরণ লাগিয়ে রাম মন। তাতে এক অনির্বচনীয় অবস্থা হবে, তাই ব্রহ্ম। এইটি কবীর সাহেব বলছেন বিচার করে।

'কবীর অজপা সুমিরণ্ হোৎহায়, কহো শাস্ত্ কোহি ঠৌর।
কর্ জিহ্বা সুকিরণ্ করে, এহ সভ্ মন্কি দৌড়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, অজপা স্মরণই হচ্ছে সাধুদের একমাত্র জায়গা আর হাতে মালা জপাও জিবের দ্বারা নাম করা, এটি মনের দৌড় মাত্র। আসলে কাজে কিছু হয় না।

'কবীর অজপা সুমিরণ্ হোৎহায়, শূন্য মণ্ডল অস্থান।
কর্ জিহ্বা তাঁহা না চলে, মন্ পঙ্গুল তাঁহা যান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, অজপা স্মরণে শূন্যমণ্ডলে স্থিতি হয়, কর ও জিব সেখানে পারে না যেতে। মনও পঙ্গুর মতো সেখানে যেতে পারে না।

'কবীর মালা কাট্কি, বহুৎ জন্ করি ফের্।
মালা ফের শ্বাস কি, যামে গাঁঠি নাহি সুমের্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কাঠের মালা ফিরিও না, শ্বাসের মালা ফেরাও, যাতে গাঁট নেই সুমেরুর।

'কবীর মন্ মালা সদ্‌গুরু দেই, পওন্ সুর্‌তিতে পোয়ে।
বিনু হাতে নিশিদিন্ ফিরে, ব্রহ্ম জপ্ তাঁহা হোয়ে।

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু মনরূপ মালা বলে দিয়েছেন। বাতাসে মালা গেঁথে রাখো। বিনা হাতে দিনরাত ফেরাবে। তারপর জপ হবে ব্রহ্ম।

'কবীর মালা জপ্ না কর জপ, মুখ্‌তে কহু না রাম।
মন্ মেরা সুমিরণ্ করে, মায় পায়ে বিশ্রাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মালাও জপ করো না, করও জপ করো না, মুখেও রাম বলো না। আমার মন আপনি স্মরণ করছে, আমি পেয়েছি বিশ্রাম।

'কবীর মালাতো কর্‌মে ফিরে, জিহ্বা ফিরে মুখ্ মাহি।
মনুয়া তো চৌদিশ্ ফিরে, ইয়েতো সুমিরণ্ নাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মালা ফিরছে করের দ্বারা। জিবও ফিরছে মুখের মধ্যে। মনও ফিরছে চারদিকে। এদের দ্বারা স্মরণ হয় না।

'কবীর রাম নামকা সুমিরণ্, হাঁসি করে ভৌ খিঝ্।
উল্টা সুল্টা নিপ্‌জে, য্যাসেঁ ক্ষেৎ কা বীজ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি রাম নামের স্মরণেতে সর্বদা রয়েছেন তাঁর ওপরে জগতের লোকে বিরক্ত, হাসি, তামাসা করে কিন্তু এতে তাঁর কোনো ক্ষতি হয় না। তবে তাতে একটু হেলে যায় মাত্র। তাতে ক্ষতি কী—যেমন ক্ষেতের বীজ উল্টো করেই ছড়াক আর সোজা করেই ছড়াক, কিন্তু অঙ্কুর উঠবে ওপর দিকে ও শেকড় যাবে মাটির নীচে। অর্থাৎ যেমন তেমনি থাকবে।

'কবীর সুমিরণ্ মাহ লাগই দে, সুর্‌তি আপ্‌নি শোয়ে।
কহুহি কবীর সংসার গুণ্, তুঝে না ব্যাপে কেয়ে।'

অর্থাৎ, স্মরণেতে লাগিয়ে দাও মনকে। তাহলে মন আর অন্যদিকে না গিয়ে সে আপনি শুয়ে থাকবে অর্থাৎ স্থির থাকবে। কবীর বলছেন, তাহলে সংসারের গুণ আর তোমাতে লিপ্ত হতে পারবে না।

'কবীর সুমিরণ সুরতি সো, হোৎ রহৎ হায় মোর।
অগুট মুখ্ সুমিরণ্ করে, অহিনিশি কই করোর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভালোরূপ স্মরণ আমার সবসময়েই হচ্ছে অর্থাৎ মন সর্বদাই লেগে আছে আর মুখে চীৎকার করে দিনরাত কতো কোটি স্মরণ করছে।

'কবীর রগ্ রগ্ বোলে রামজী, রোম্ রোম্ র ঝঙ্কার।
সহজেই ধুনি লাগি রহে, কহঁহি কবীর বিচার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রত্যেক নাড়ীতে নাড়ীতে রাম চলছে আর প্রত্যেক লোমকূপের রাম ওঁ ওঁ করে বলছেন। আপনা-আপনিই লেগে রয়েছে ঐ ধ্বনি, এইটি বলছেন কবীর সাহেব বিচার করে।

'কবীর সহজ্ হি ধুনি লাগি রহে, সেতো এহ ঘট্ মাহিঁ।'
হির্দে্ হরি হরি হোৎ হায়, মুখকি হাজতি নাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সহজরূপ ধ্বনি এই শরীরের মধ্যে লেগেই রয়েছে। হৃদয়ে হরি হরি সবসময়ে হয়, মুখে প্রয়োজন কি?

'কবীর পাঁচ্ সখি পিউ পিউ করে, ছটা সুমির্ মন্।
আই সুর্তি কবীর কি, পায়া রাম রতন্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পঞ্চ ইন্দ্রিয় 'পিউ। পিউ!' করছে। পিউ অর্থাৎ স্বামী—পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ সখী অর্থাৎ প্রকৃতি, মন যিনি তিনি স্মরণ করছেন। এরূপ অবস্থায় কবীর অমূল্য রত্নস্বরূপ পেয়েছেন রামকে।

'কবীর মেরা মন্ সুমিরে রামকো, মেরা মন্ রামহি আহি।
আপ্নে রামহি হোয়, শিষ্ নোয়ায়োঁ কাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমার মন স্মরণ করছে রামকে। এখন মনও রাম আপনিও রাম হয়ে গেলো। এখন মাথা নোয়াবে কার কাছে ?

'কবীর তু তু কর্‌তে তু ভয়া, মুঝ্‌মে রহি নহু।
ওয়ারোঁ তেরে নাম্ পর্, জিৎ দেখ্‌তি ত তুঁ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তুমি তুমি করতে তুমিই হয়ে গেলে, তখন আর আমি রইলো না। বলিহারি তাঁর নামের ওপর। যেদিকে দেখো সেইদিকেই তুমি অর্থাৎ দুই নেই, সব হয়ে গেছে এক। বলবারও লোক নেই।

'কবীর তু তু কর্‌তে তু ভয়া, তুঝ্‌মে রহে সমায়।
তোমহিঁ মাহি মিল রহা, আব মন অনৎ ন যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যখন তুমি তুমি করাতে তুমিই হয়েছি ও তোমাতেই রইলুম আর তোমার মধ্যে গিলে রইলুম, তখন আর মন অন্য জায়গায় যায় না।

'কবীর সুমিরণ্ ছোড়িকে, পল যো বাহর্ যায়ে।
কহেঁ কবীর সুমিরণ্ বিনা, কহো কাঁহা ঠাহরায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্মরণ ছাড়া এক পলমাত্র যদি মন অন্যদিকে যায়, বিনা স্মরণেতে কোথাও স্থির হবার জায়গা নেই। কোথায় দাঁড়াবে ? স্মরণ ছাড়া সবই যে চলায়মান্।

'কবীর কহেতা যাৎ হোঁ, শুন্‌তা হায় সব কোয়ে।
রাম কহে কল্ হোয়েগা, নেহি তো ভালা না হোয়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সকলেই তো বলেছেন আর সকলেই তো শুনছেন, রামনাম করলে ভালো হবে, না করলে অনিষ্ট হবে। ভালো হবে না।

'কবীর ভালি ভেঁয়ি হরি বিছ্‌রেয়ে, শিরকি গেয়ি বালাই।
হাম য্যায়সে ত্যায়সে রহে, আব্ কুছ্ কাহি না যায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভালো হয়েছে, এখন হরি বলা ভুলেছি।

মাথার বালাই ভার নেমে গেছে। এখন আমি যা ছিলুম তাই হয়েছি। এ অবস্থা যে কী তা আর বলার যো নেই।

'কবীর জন্ কবীর বন্দন্ করে, কিস্ বিধি কিযিয়ে সেও।
ওয়ার্ পার্ কি গমি নেহি, তু মন্ মন্ মনিজ্ দেও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভক্তেরা বন্দনা করছে ও বলছে যে কী বিধির দ্বারায় সেবা করবো! যে বস্তুর সীমা নেই তার পারের ঠিকানা নেই। অতএব তুমি মনস্বরূপ মনের দ্বারায় মনকে অর্পণ করো। এইটিই হচ্ছে সেবা। নতুবা সেবা কাকে কে করবে!

॥ বুদ্ধির বিষয় বর্ণনা ॥

'কবীর আকিল্ অরশ্তেঁ উতরি, বিধিনা দিন্হো বাঁটি।
এক্ অভাগা রহি গয়া, একন্ হ লিয়া সুঘাটি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পরব্রহ্ম হতে যে বুদ্ধ নেমে এসেছে ভগবান তা সকলকে সমান ভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। এক সুন্দর ঘাট নিয়ে আমিই অভাগ্য হয়ে থেকে গেছি। অভাগ্য অর্থাৎ যাঁর ভাগ্য নেই অর্থাৎ ভাগ্যাতীত হয়ে রয়ে গেছেন।

'কবীর যস্ পন্ছী বন্ধন্ পরা, সুয়া কে বুদ্ধি নাহিঁ।
আকিল্ বিহুনা মানোয়া, এও বন্ধা জগ মাহিঁ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে পাখী বন্ধনে পড়েছে তার নেই বুদ্ধি। মানুষও বুদ্ধিছাড়া এই জগতে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনে পড়ে রয়েছে।

'কবীর বিনা ওসিল্ চাকরি, বিনা আকিল্ কি দেঁহ।
বিনা জ্ঞান্কা যোগিয়া, ফির্ লাগায়ে খেহ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিনা আদায়ের চাকরি অর্থাৎ বেতন পান না অথচ চাকরি করেন আর বিনা বুদ্ধির দেহ অর্থাৎ কোনো বিষয়েরই স্থির বুদ্ধি নেই, হিতাহিত জ্ঞান নেই অথচ দেহ ধারণ করেছে। আর বিনা জ্ঞানের যোগী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন নি অথচ

যোগী উপাধি ধারণ করেছেন, এমন ব্যক্তিরাই খেয়া অর্থাৎ যাতায়াত রূপ খেয়া দিচ্ছে।

'কবীর জল পর ওয়াণে মছরি, ঘট পর ওয়াণে বুদ্ধি।

যাকো য্যায়সা গুরু মিলা, তাকো ত্যায়সা শুদ্ধি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি যেমন গুরু পেয়েছেন, তাঁর তেমনি শুদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ তাঁর তেমনি জ্ঞান হয়েছে; যেমন জলপ্রমাণ মাছ, অগাধ জলে বড় মাছ থাকারই কথা, আর অল্প জলে ছোট মাছ থাকারই সম্ভাবনা আর যিনি যেমন ঘট পেয়েছেন তাঁর বুদ্ধিও তেমনি। ঘট অর্থাৎ নানাজাতীয় শরীর আছে, যেমন গবাদি জীবেরও শরীর আছে, যার যেমন আধার তার তেমনি বুদ্ধি।

॥ উপদেশের অঙ্গ বর্ণনা ॥

কবীর হরিজী এহি বিচারিয়া, সাখি কঁহে কবীর।

ভও সাগর্‌মে জীব্‌ হায়্‌, শুনী কৈ লাগে তীর।'

অর্থাৎ, ভগবান হরির বিচার করে কবীর সাহেব সাক্ষি বলছেন। সাক্ষি — স + অক্ষি = (স — সহিত + অক্ষি — চক্ষু) চক্ষু-স্বরূপ, যে চক্ষু সৎগুরু দেখিয়ে দেন তিনিই এক নিত্য সাক্ষিস্বরূপ, তাঁর বিষয় কবীর বলছেন। কারণ ভবসাগরের মধ্যে জীবকে পড়ে থাকতে দেখে তাঁর শরীরে যেন তীরের মতো লাগছে, তার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সাক্ষি বলছেন।

'কবীর কাল্‌ কাল্‌ তৎকাল্‌ হায়, বুরা না কহিয়ে কোয়ে।

অন্‌ বোওয়ে সো দাহিণো, বোওয়ে সো লূন্‌তা হোয়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কালই সেই ব্রহ্মা হচ্ছেন, কেউ তাকে মন্দ বলে না। বীজ বপন করলেই ফলভোগ করে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর হাতে পড়ে রইলো, আর যে রোপণ না করলো অর্থাৎ যে ভালো-মন্দ না বললো—সে মুক্ত হয়ে গেলো।

'কবীর যো তোকো কাঁধ বোয়ে, তাকো বোয়ো তুঁ ফুল্ ।
তোকো ফুল্‌কা ফুল্ হায়, ওয়াকো হায় ত্রিশূল্ ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে তোমাকে সৎকর্ম করতে কণ্টকরূপ বাধা দেয়, তুমি ফুলরূপ মিষ্ট বাক্যদ্বারায় তাকে সন্তুষ্ট করে সৎকর্মে আন। তোমার ফুলরূপ কথাই কাজের কথা আর ওর কথা ত্রিশূলের মতো। নিজের কথার দোষে মরবে নিজেই অর্থাৎ সৎকর্মে যে বাধা দেয় সে নিজেই মরে।

'কবীর কহেতে কো কহি যান্ দে, উন্‌হকি বুদ্ধ্ মৎই লেহু।
শাকট্ আও পুনি শোয়ন্ কো, ফেরি জবাব মৎই দেহু ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যারা কেবল কথাই বলে থাকে তাদের বুদ্ধি নিয়ো না। তারা যা বলছে বলে যাক, শোনার দরকার নেই— যেমন কুকুরের স্বভাব ঘেউ ঘেউ করা। সে এরূপ করুক্। তাকে আর জবাব দিও না।

'কবীর হস্তী চড়ায়ে জ্ঞান্‌কে, সহজ দোলেচা ডারি।
শোয়নরূপ্ সংসার হায়, ভুকন্ দে ঝকমারি ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হাতির ওপর সহজরূপ তুলিচা পেতে জ্ঞানকে তার ওপর বসাও। কিন্তু এ-সংসার প্রায়ই কুকুররূপী। তারা অনর্থক ঘেউ ঘেউ করবে। তাতে কোনো ক্ষতি নেই, তাদেরকে ডাকতে দাও।

'কবীর গারিতে সভ্ উপজে, কাল্ কষ্ট আরু মিচ্।
হারি চলে সো সাধু হায়, লাগি মরে সো নীচ্ ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গালাগালিতে সবই উৎপন্ন হতে পারে। ক্রমশ কাটাকাটিও হতে পারে। যদি কিছু না হয় মনের কষ্টও হতে পারে। এই কারণে তা করা উচিত নয়। সাধু যাঁরা তাঁদের কেউ কিছু গালাগালি দিলে হার মেনে চলে যান। আর নীচ যারা তারা করে মরে ঝগড়া।

'কবীর কহে ম্যায় ক্যা কহোঁ, থাকে ব্রহ্মা মহেশ।
রাম নামৃত তু সার হায়, সভ কাহু উপদেশ ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমি আর কী বলবো! যে অবস্থার কথা ব্রহ্মা, মহেশও থেকে গেছেন অর্থাৎ বলতে পারেন নি। রামনামই সার হচ্ছে জানবে, আর উপায় নেই। আত্মারাম ছাড়া গতি নেই। এই হচ্ছে সকলকার উপদেশ।

'কবীর যিনহ্ য্যাসা হরি জানিয়া, তিন্ হকোঁ ত্যাসা লাভ।
য্যায়সে পিয়াস্ ন ভজাই, যব্ লাগি ধসে ন আর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি যেমন হরিকে জেনেছেন তাঁর তেমনি লাভ। যেমন যতটুকু জলপান করবে ততটুকু পিপাসা মিটবে। যখন একেবারে অধিক পরিমাণে জল খাবে তখন লাগবে না পিপাসা।

'কবীর রামনাম কি লুট্ হায়, লুটি শকে সো লুট্।
ফেরি পাছে পছ্তাহুগে, যব্ তন্ যাঁইহে ছুট্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনামের লুট হচ্ছে। যদি লোটবার ইচ্ছে হয় তবে লুটে নাও। তা না-হলে দেহত্যাগের সময় বড় অনুতাপ হবে।

'কবীর ইস্ ছুনিয়ামে আইক্যেয়, ছোরি দেও তোম্ আয়েট্।
লেনা হোয় সো লেইলে, উঠি যাতু হায় পায়েট্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই জগতে এসেছো এক মুহূর্তের জন্যে। সুতরাং অহঙ্কার করো না। আর যদি নিতে হয়, তবে এইবেলা নাও। কেননা দিনদিন তোমার প্রাণ উঠে যাচ্ছে।

'কবীর কুরু বন্দে তু বন্দেগি, যো পাওয়ে পাক্ দিদার।
আঁওসর মানুখ্ জন্ম কা, হোয় না বারম্বার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যদি তুমি ভগবান কূটস্থ ব্রহ্মকে পেয়ে থাকো তাহলে বন্দনা করে নাও। কারণ এমন মনুষ্য জন্ম বারংবার আর হবে না।

'কবীর যোহি মারগ্ সাঁই মিলে, তাঁহি চলো করি হোস্।
ফেরি পাছে পছতাওগে, কহে না মানসী রোষ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে রাস্তায় ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তাতে খুব সাবধান হয়ে চলবে। কেননা তা না করলে পরে হবে অনুতাপ। আর যদি আমার কথা না শোনো তাহলে মনেতে হবে রাগ।

'কবীর বার বার তো সোঁ কহু', শুন্‌রে মন্নুয়া নীচ।
বণিজারাকে বয়েল্ যেঁও, প্যায়রে মাহি মিচ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রে নীচ মন! তোমায় বারবার বলছি! তুমি শুনছো না! তুমি বোল্‌দের বলদের মত (বল্‌দে—যারা বলদের পিঠে মাল বোঝাই করে হাটে বা বাজারে বিক্রি করে তাদেরকে বোল্‌দে বলে) মাটি ভেঙে হাটে-বাজারে মিথ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'বণিজারে কে বয়েল্ যেঁও, টাণ্ডা উৎরা আয়।
এক নহকে হুনা ভায়ি, এক্ চলে মূল্ গোঁয়ায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বোল্‌দের গরুর পিঠের যে বোঝা তা দু'দিকের বোঝা নামালে খালাস পায়। খালাসই লাভ। এক মূলে হলো দুনো ব্যাপার। কেউ বা একমূল্ নিয়ে চিরকাল কাটালো। কেউ বা খোয়ালো মূল।

'কবীর বণিজারেকে বয়েল্ যেঁও, ভরমৎ ফিরে চোঁহু দেশ।
খাঁড় লহে ভূষ্ খাতু হায়, বিন্ সৎগুরু উপদেশ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বোল্‌দের বলদ যেমন খাঁড় গুড় বোঝাই করে চারদিকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সৎগুরুর উপদেশের অভাবে গুড় বোঝাই থাকতেও ভূষী খাচ্ছে।

'কবীর হরিকা নাম লে, ত্যজি মায়া বিখ্ বোজ্।
বার্‌বার নাঁহি পাই হো, মানুখ্ জনম্ কি মোজ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মায়ারূপ বিষ পরিত্যাগ করে গ্রহণ করো হরিনাম। কারণ এমন মনুষ্যজন্মের মজা পাবে না বারংবার।

'কবীর জোরা আয়ে জোর কিয়া, পিয়া আপনা পহিচাঁন্।
লেনা হোই সো লেইলে, উঠৎ হায় খরিহান্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যখন শরীরে বল এলো তখন বায়ুও জোর করলো। তখন আপনাআপনি স্বামীকে চিনতে পারলো। এখন যা তোমার পাবার ইচ্ছে থাকে, তা তাঁর কাছে চেয়ে নাও। শস্য তোলার সময় উপস্থিত হলেই খামারে উঠোয়।

'কবীর যৌবন যাসি দেঁহ ত্যজি, চলে নিশান্ বজায়।
শির্ পর শ্বেত সরায় চা, দিয়া বুঢ়াপা আয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যৌবন যখন দেহ ত্যাগ করে চলে যায়, তখন চিহ্নস্বরূপ নিশান উড়িয়ে চলে অর্থাৎ মাথায় পাকা চুল ও বৃদ্ধ অবস্থা এসে দেখা দিলো।

'কবীর জোরা আয়ে জোর লিয়া, সোহানী দিন্হ গিট।
আঁখন্ উপর কে চুলি, বিখ্ ভর খায়ে মীট্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যৌবন গত হয়ে বৃদ্ধাবস্থা এসেছে। এখন বলের দ্বারায় সাধনে অক্ষম। শরীর শিথিল হয়ে গেছে, চোখে পড়েছে ছানি। আগে যে-সব জিনিস মিষ্টি ভেবে বিষ খেয়েছে এখন তার জ্বালায় অস্থির হচ্ছে। আবার কালও এসেছে কাছে।

'কবীর কণন্হ লাগি বোল্ কহে, মন নেহি মানে হারি।
রাজ বেরাজি হোত্ হায়, শাকে তো রাম সন্তারি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কানের কাছে কথা বলতে হচ্ছে। কারণ কানে শুনতে পায় না, মনও মানে না। সকল বিষয়েই খিটখিটে হয়েছে। কোনোটাতে বা রাজি হচ্ছে, কোনোটাতে বা অরাজি হলো। তৃপ্তি নেই কিছুতেই। এ অবস্থায় পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় আত্মারাম, রামচন্দ্র সম্বল হলে আর কষ্ট হয় না।

'কবীর উচাঁ দিশেই ধৌ রহরা, মঢ়ি চিতাওয়ে শোল।
এক্ হরিকে নাম বিন্নু, যম্ পারেগা রোল।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বৃদ্ধাবস্থায় সাধন-ভজন বড় কষ্ট। উচ্চ ও দূর বোধ হয়। তার ওপর আবার মায়া চারদিকে ঘিরে রয়েছে।

এমন অবস্থায় হরিনাম ছাড়া নিস্তার নেই। তা না হলে একদিন যম লাগিয়ে দেবেন কান্নাকাটি।

'কবীর ত্যজি ছুটা সহর্মে, কস্বে পরি পুকার।
দরওয়াজা দিয়া রহ, নিকলি গেয়া অসোয়ার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মনস্বরূপ আত্মা সহায় ছেড়ে যাওয়ার জন্যে পাড়ার লোকেরা চীৎকার করছে। দরজা সব বন্ধ রয়েছে অথচ যিনি ছিলেন তিনি নেই।

॥ ভক্তির বিষয় বর্ণনা ॥

'ভক্তি দিলাওল্ উপজি, ল্যায়ে রাঁমানন্দ্।
পরগট্ কিয়া কবীরজী, সাত দ্বীপ্ নও খণ্ড্।'

অর্থাৎ, রামানন্দ ভক্তিস্বরূপ এনে দিলেন বীজ আর কবীরজী প্রকাশ করলেন সপ্তদ্বীপ আর নবদ্বার।

কবীর ভক্তি নিশেনী মুক্তি কি, চড়ে সন্ত্ সভধায়ে।
যিন্হ প্রাণী আলস্ কিয়া, জন্ম গয়ে জহড়ায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভক্তিই মুক্তির চিহ্নস্বরূপ। সাধু তাতে চড়ে চলেছেন। যে প্রাণী তাতে আলস্য করে তার জন্ম বিফলে গেলো।

'কবীর কাজ্ ছরে নহিঁ ভক্তিবিন্, লাক্ কথয়ে যও কয়ে।
শব্দ সনেহি হোয় রহে, খর্কো পঁহুচেয় শোয়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিনা ভক্তি-বিশ্বাসে কাজ হয় না। লক্ষ লক্ষ কথায় কিছু হবে না। যাঁর ওঙ্কার ধ্বনিতে জন্মেছে স্নেহ আর যিনি পৌঁছেচেন ঐ ওঙ্কার ধ্বনির ঘরে, তাঁরই হতে পারে।

'কবীর ক্ষেৎ বিগারে খড়থুয়া, সভা বিগারে কুর্।
ভক্তি বিগারে লাল্চী, যেঁ ও কেশরীমে ধুর্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ক্ষেত্র যেমন নষ্ট করে আগাছায় আর সভা যেমন নষ্ট করে কুষ্ঠ রোগীতে, তেমনি লোভও নষ্ট করে ভক্তিকে— যেমন জাফ্রান নষ্ট হয়ে যায় ধুলায়।

'কবীর ত্রিমিরি গই রবি দেখ্‌তে, কুম্‌তি গই গুরুজ্ঞান।
সত্য গই এক্‌ লোভ্‌তে, ভক্তি গই অভিমান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সূর্য দেখার জন্যে নষ্ট হয়েছে অন্ধকার। সৎগুরুর জ্ঞানেতে নষ্ট হয়েছে কুমতি। সত্য যিনি তিনি এক লোভেতেই নষ্ট হয়ে থাকেন। ভক্তিও নষ্ট হয়ে যায় অভিমানে।

'কবীর ভক্তি ভাও ভাদো নদী, সভে চলে ঘহরায়ে।
সলিতা সোই সরাহিয়ে, যো জেঠ্‌ মাস ঠহরায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভক্তির ভাব ভাদ্রমাসের নদীর মতো। সে টানেতে যে পড়ে সেই যায় চলে। যিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের মতো শুক্‌নো অবস্থা জেনেও যেতে পারেন, তিনিই উত্তম।

'কবীর কহেঁ পুকরি কৈ, ক্যা পণ্ডিৎ ক্যা শেখ্‌।
ভক্তি হেতু শব্দে গহে, বহুরি না কাছৈ ভেখ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর উচ্চৈস্বরে পণ্ডিত ও শেখ্‌কে বলছেন, ভক্তির জন্যে ওঁকার ধ্বনিতে রত হও। তাহলে আর মিথ্যে ফোঁটা কৌপীন নিয়ে ভেক করতে হবে না।

'কবীর কামী ক্রোধী লাল্‌চী, ইন্‌হতে ভক্তি না হোয়ে।
ভক্তি করে কৈ শূরীয়াঁ, তন্‌ মন্‌ লজ্জা খোয়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কামী, ক্রোধী ও লোভী এদের ভক্তি হয় না। শরীর, মন, লজ্জা নষ্ট করে কোনো কোনো শূর ভক্তি করে থাকেন।

'কবীর ভক্তি দোয়ার হায় সাঁকরা, রহি দশয়ে ভায়।
মন ঐরাওৎ হোয়ে রহা, কিস্‌ বিধি পয়টা যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভক্তির দ্বার অতি সূক্ষ্ম। যা দশদ্বার দিয়ে সূক্ষ্মভাবে জানা যাচ্ছে। মন যিনি তিনি তো হাতির মতো হয়ে রয়েছেন। কীভাবে তার ভেতরে প্রবেশ করবে ?

'কবীর জ্ঞান ন বেধিয়া, হীর্দয়া নহিঁ জুড়ায়ে।
দেখা দেখি ভক্তি করে, রঙ্গ নহি ঠাহরায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জ্ঞানকে ভেদ করতে না পারলে শীতল হয়

না হৃদয়। আর যাঁরা দেখাদেখি ভক্তি করেন তাঁরা প্রকৃত শান্তি পান না।

'কবীর ছেমা ক্ষেৎ ভল্ জোতিয়ে, সুমিরণ্ বীজ জমায়ে।
খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড শুখা পরৈ, ভক্‌তি বীজ নহি যায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ক্ষমারূপ ক্ষেত্রে ভালোরূপ লাঙ্গল দাও, তাতে রোপন করো স্মরণরূপ বীজ। খণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড শুকুতে পারে, কিন্তু বিফল হয় না ভক্তিরূপ বীজ।

'যেঁও জল প্যারো মছরি, লোভী প্যারো দাম্।
মাত্‌হি প্যারো বালকা, ভক্তি পিয়ার রাম।'

অর্থাৎ, মাছ যেমন জলে থাকতে ভালোবাসে আর জলছাড়া হলে প্রাণত্যাগ করে, তেমনি লোভী মানুষ পয়সা ছাড়া কিছু চায় না। যেমন বালক মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, তেমনি রামছাড়া থাকে না ভক্তি।

'কবীর ভক্তি ভেখ্ বড় অন্তরা, যৈছে ধরণী অকাশ্।
ভক্ত যো সুমিরৈ রাম কৌ, ভেখ্ জগৎ কি আশ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভক্তি ও ভেক বড় অন্তর, যেমন আকাশ ও পৃথিবী। ভক্তই স্মরণ করেন রামকে আর ভেকধারী আশা করে থাকেন জগতের।

'কবীর্ পর্ নাঁ তাতে হোৎ হৈ, মন্‌তে কিযৈ ভাও।
পরমারথ্ পরতীৎ মে এহ তন্ রহে কি যাও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তোমার পরেতে আত্মবোধ হচ্ছে আর মনেতে যে ভাব হচ্ছে তাই করছে। যখন তোমার পরমার্থ প্রতীতি হবে তখন আর এই শরীর থাক বা না-থাক তাতে ক্ষতি হবে না।

'কবীর যব্ তব্ ভক্‌তি সকামতা, তব্ তক্ নিহফল্ সেও।
কহ কবীর ওহোঁ কোঁও মিলে, নিহংকামী নিজ দেও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যতক্ষণ সকাম ভক্তি থাকবে, ততক্ষণ তোমার নিষ্ফল হবে। নিষ্কামভাবে ভক্তি করলে নিজের দেবতাকে পাওয়া

যায় অর্থাৎ যতক্ষণ কামনা থাকবে, ততক্ষণ তাঁকে পাওয়া যাবে না।

॥ প্রেম বিষয়ক বর্ণনা ॥

'এহ তো ঘর্ হৈ প্রেমকা, খালা কা ঘর্ নাহি঳।
শিষ্ উতারে ভূঁই ধরে, সো পইটে ঘর্ মাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই তো প্রেমের ঘর। এতো আর অন্যের ঘর নয়। যিনি মাথা নামিয়ে ভূমিতে ধরেন, তিনি প্রবেশ করবেন ঘরের মধ্যে।

'কবীর শিষ্ উতারে ভূঁই ধরে, উপর্ রাখে পাঁও।
দাস কবীরা এয়েঁা কহে, য্যায়সা হোয়েতো আও।'

অর্থাৎ কবীর বলছেন, মাথা ভূমির দিকে আর পা ওপর দিকে রেখে কবীরদাস বলছেন, এমনি ভাবে পারো তো এসো।

'কবীব এহ তো ঘর্ হায় প্রেম্কা, মারগ্ অগম অগাধ্।
শিষ কাট্ পালরা ধরে, লাগে প্রেম্ সমাধ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এতো প্রেমেরই ঘর। আর আর অগম্য পথে যাবার এই-ই পথ। যদি মাথা কেটে পাল্লা ঠিক করে অর্থাৎ ছ'দিকের পাল্লা সমান করে, তাহলেই লাগলো প্রেমের সমাধি।

'কবীর প্রেম্ ভক্তিকা ঘড়া, উচাঁ বহুতক্ মাথ্।
শিষ্ কাট্ পগুতর্ ধরে, তব্ পঁহুছেগা হাৎ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেমরূপ ভক্তির ঘড়া রয়েছে মাথা ছাড়াও অনেক উঁচুতে। হাত দিয়ে তাকে ছোঁয়া যায় না। মাথা কেটে পায়ের নীচে ধরলে তখন হাতে পাওয়া যায়।

'কবীর প্রেম ন বারি উপজে, প্রেম ন হাট্ বিকায়।
বিনা প্রেমকা মানোয়া, বান্দা যমপুর্ যায়।'

াৎ, কবীর বলছেন, প্রেম উৎপন্ন হয় না জল হতে। প্রেম

হাটেও বিকোয় না। প্রেমরহিত যে-মানুষ তিনি বন্ধন অবস্থায় যান যমপুরে।

'কবীর শীষ্ উতারণ ন কাহা, দিন্হো ভাও বতায়ে।
তিনো লোককা শীষ্ হায়, জোরে উতারা যায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মাথা কাটবার কথা যে বলেছি তা নয়। ও এক ভাবের অবস্থার বিষয় বলেছি। তিন লোকেরই মাথা আছে। জোর করে নামালেই যায়।

'কবীর প্রেম পিয়ালা সো পিয়ে, যো শীষ্ দচ্ছিনা দেয়।
লোভী শীষ্ না দে শকে, নাম প্রেমকা লেয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেমামৃত বাটি ভরে তিনিই পান করেন যিনি নিজের মাথা দেন গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপ। আর লোভী ব্যক্তি দিতে পারেন না। খালি নামেতেই নিয়েছেন প্রেম, কাজের প্রেম পান নি।

'কবীর শীষ্ কাট্ পযঙ্গা কিয়া, জীউ সুরাহী ভরিলীন্।
যেহি ভাবে সো আইলে, প্রেম আমি কহি দীন্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মাথা কেটে, পাষাণ ভেঙে জীব কুঁজোরূপ শরীরে ভরে নিলেন প্রেম। যে-লোক ভরে নিতে ইচ্ছে করো, এসো। ভরে নাও এই অগম্য প্রেম। দীন কবীর এই কথাই বলছেন।

'কবীর প্রেম পিয়ালা ভরি পিয়া, রাচি রহা গুরুজ্ঞান।
দিয়া নাগরা শব্দকা, লাল্ খাড়ে ময়দান।

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেমামৃত পান করো বাটি ভরে। তাহলেই জানতে পারবে গুরুর রচনাগুলি। নাগ্‌রার স্বরূপ ওঁকার ধ্বনির শব্দ শুনতে পাবে, যখন লাল স্বরূপ (অমূল্য মণি বিশেষ) ব্রহ্ম ময়দানে খাড়া হবে।

'কবীর ছিন্ পড়ে ছিন্ উতরে, সোতো প্রেম ন হোয়।
আট্ পহর লাগা রহে, প্রেম কহাওয়ে সোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, একবার উঠছে একবার পড়ছে। সেও তো প্রেম হচ্ছে না। অষ্টপ্রহরই যিনি লেগে রয়েছেন, তাঁর প্রেমই প্রেম।

'কবীর আয়া প্রেম্ কাঁহা গেয়া, দেখায়া সব্ কোয়।
পল্ রোয়ে পল্ মো হাঁসে, সোতো প্রেম্ না হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেমতো এসেছিলো আবার গেলো কোথায়! সকলেই কিন্তু দেখেছিলেন এক মুহূর্তে হাসছে, এক মুহূর্তে কাঁদছে। সেও তো প্রেম হলো না।

'প্রেম্ প্রেম্ সব্ হিঁ কহে, প্রেম না চিন্ হে কোয়।
যেঁাহি ঘট্ প্রেম্পিঞ্জর বসে, প্রেম্ কহাওয়ে সোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেম প্রেম তো সকলেই বলছেন কিন্তু প্রেমকে কেউই চেনে না। যাঁর দেহরূপ পিঞ্জরে বসেছে প্রেম, তাঁর প্রেমই শোভা পায়।

'কবীর প্রেম্ ন চিন্ হিয়া, চাখি ন কিন্ হো সোয়া দেয়।
শুনে ঘরকা পাহুনা, যেঁও আওয়ে তেঁও যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেম তো চিনলুম না আর প্রেমের আস্বাদনও পেলুম না। যেমন শূন্য ঘরের অতিথি অর্থাৎ যেমন এলো তেমনি গেলো। কিছুই জানতে পারলুম না।

'কবীর প্রেম পিয়ারে লাল্ সো, মন্ মো কিন্ হো ভাও।
সদ্গুরুকে প্রতাপ্ তে, ভালা বনা হায় দাঁও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেমামৃত পান করে লালস্বরূপ ব্রহ্মেতে মনজহুরী ভাব করেছে অর্থাৎ সর্বদা লেগে রয়েছে। এরূপ দাঁও পেয়েছি সদ্গুরুর প্রতাপেই।

'কবীর এহ তন্ জ্বারোঁ মসি করোঁ, লিখো রাম কো নাম।
লিখ্নী করো করক্ কি, লিখি লিখি পঠাও রাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই শরীরকে জ্বালিয়ে প্রস্তুত করো কালি। সেই কালিতে লেখো রামনাম। আর মনকে কর্মের কলম করে রামের নাম লিখে পাঠাও।

॥ বিরহের বিষয় ॥

'কবীর পীর পীরানী বির্‌হ কি, আওর না কছু সো হায়ে।
যায়সি পীর হায় বির্‌হ কি, রহি কলেছে ছায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহ-যন্ত্রণায় আর কিছুই ভাল লাগছে না। এমনি বিরহ-যন্ত্রণায় হৃদয়কে ছেয়ে ফেলেছে।

'কবীর চোট্ সন্তাওয়ে বির্‌হ কি, সব্ তন্ ঝন্ঝরা হোয়ে।
মার নিহারা জান্ছি, কি যিস্কা লাগি হোয়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহ-যন্ত্রণার চোট্ সহ্য করতে করতে সমস্ত শরীর ঝাঁঝরার মতো হয়ে গেছে। সেই বিরহের মার খেয়ে যে জেনেছে ও যার লেগেছে সেই জেনেছে।

'কবীর বিরহ ভুজঙ্গম্ তন্ ডছেও, মন্ত্র ন লাগে কোয়।
রাম বিয়োগী না জঁীয়ে, তো বাযুর হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহরূপ ভুজঙ্গ শরীর দংশন করছে। সেই বিরহরূপ ভুজঙ্গের বিষে কোনো মন্ত্রও খাটে না। রাম বিয়োগী ব্যক্তি জীবনধাবণ করতে পারেন না। যদিই বাঁচেন তাহলে পাগল হয়ে থাকেন।

'কবীর বিরহ ভুজঙ্গম্ পৈঠিকে, কিয়া কলেজে ঘাও।
বির্‌হিনী অঙ্গ্ ন মোরই, যো ভাওয়ে তো খাও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহরূপ ভুজঙ্গ হৃদয়ে বসে, হৃদয় ঘা করে দিয়েছে। কিন্তু বিরহিনী যিনি, তিনি সহ্য করে যাচ্ছেন, একবারও পাশও ফেরেন না অর্থাৎ যেমন তেমনিই থাকেন। এখন যা ভালো লাগে, তা খাও।

'কবীর রগ্‌রগ্ বজে রবাব তন্, বিরহ সন্তায়ে নিৎ।
অওর্ ন কোই শুন্‌সি, সাঁই শুনে কি চিৎ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রতি শিরাতে শিরাতে রবাব (ওঁকার ধ্বনি) বাজছে, কিন্তু বিরহ সর্বদাই সন্তাপ দিচ্ছে বলে ঐ ওঁকার ধ্বনি শুনতে দিচ্ছে না। কেবল ভগবান কূটস্থ ব্রহ্মাই শুনছেন।

'কবীর বিরহ যো আয়ও দরশ্ কো, কড়ুয়া লাগা কাম্।
কায়া লাগি কাল্ হোয়ে, মিঠা লাগা রাম্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহ যখন দেখলো যে আমার এই শরীরই কাল হয়েছে, তখন কামনাগুলি মন্দ বোধ হতেলাগলো। কেবল এক রামনাম মিষ্টি লাগতে লাগলো আর সব মিথ্যে বোধ হলো।

'কবীর ইহ তন্ কো দীয়লা করো, বাতি মেলো জীউ।
লোহু সিচো তেল করি, তব্ মুখ্ দেখ পিউ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই শরীরকে করো প্রদীপ, আর জীবকে বানাও সলতে। আর শরীরের রক্তকে করো তেল। তাহলে দেখবে স্বামীকে।

'কবীর বিরহবিনা তন্ শূন্য হায়, বিরহ হায় সুলতান।
যা ঘট্ বিরহ ন সঞ্চারে, সো ঘট্ জানু মশান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহছাড়া শরীর শূন্যপ্রায় হচ্ছে। আর সেই বিরহ সুলতানেরই হচ্ছে (সুলতান—যিনি সমস্ত রাজার রাজা তাকেই বলে সুলতান)। এখানে মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা। বিরহ মনেরই হচ্ছে। আর সেই বিরহ যে ঘটে প্রবেশ না করে, সেই ঘট মশান (মৃতদেহপূর্ণ) জানবে।

'কবীর বিরহ রাম পাঠাইয়াঁ, সাধুন্‌কে পর্‌মোধ্।
যা ঘট্ তালা মেলি হায়, তাকো লয় করি সোধ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, উক্ত বিরহ আত্মারামই পাঠিয়ে দিয়েছেন সাধুদের আনন্দ হবার জন্যে। আর যে ঘটে অর্থাৎ যে দেহে কুলুপ খোলা আছে, তারই সমাধি শুদ্ধ হয়েছে।

'কবীর আঁখড়িয়াঁ প্রেম কি ছুইয়া, যিন্ জানে দুখ্‌ড়িয়া।
রাম সনেহি কারণে, রোয়ে রোয়ে রতড়িয়া।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেমের জন্যে সতৃষ্ণ নয়নে খাড়া হয়ে রয়েছে। যিনি বিরহ কষ্ট পেয়েছেন, সমস্ত রাতই কেঁদে কাটাচ্ছে রামের মিলনের জন্যে।

'কবীর সোই আহে সু স্বজনা, সোই আহে লোক্ড়িয়াঁ।
যো লোচন লোহু চুয়ে, তব্ হিঁ জানিহো তড়িয়া।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সেই সুন্দর জানবে—যাঁর নয়ন হতে জল পড়ে আর যাঁর চোখ হতে রক্ত ফেটে পড়ে অর্থাৎ চোখ সর্বদা রক্তবর্ণ থাকে। তখন জানবে, তাঁর সমাধি হতে আর বেশী বিলম্ব নেই।

'কবীর হংস নাদরি করু, রোওনা সোঁ করুচিৎ।
বিন রোয়ে কো পাইয়া, প্রেম পিয়ারে মিৎ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জীবকে করো নাদস্বরূপ। এমনভাবে করো যেমন ক্রন্দনপরায়ণ মানুষের মন। বিনা কান্নায় কে প্রিয় প্রেমিক হতে পারে আর লাভ করে থাকে বন্ধুকে?

'কবীর সোতো দুঃখ ন বিসরেঁ, রোওৎ বল্ ঘটি যায়ে।
মন হি মাছ বিস্থুর না, যোঁ কাঠ্ হিঁ ঘুণ্ খায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তিনি দুঃখ বিস্মরণ করতে পারেন না আর কাঁদতে কাঁদতে শরীরের বলও কমে গেছে। মনের মধ্যে যা কিছু ছিলো সবই ভুলে গেছেন, কেবল এক বস্তুর অভাবে, যেমন কাঠে ঘুণ ধরে, ঘুণ ভেতরে ভেতরে সব খেয়ে ফোঁপরা করে ফেলেছে। বাইরে কাটখানা বজায় আছে মাত্র।

'কবীর কীঁড়ে কাঠ যো খাইয়া, খয়া কিনহু ন দিঠ্।
সো তি উঘারি যো দেখিয়ে. ভিতর জামা চিঠ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ঘুণপোকা যখন কাঠ খায় তখন কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু যে ঐ কাঠখানা উঠিয়ে দেখবে সে জানতে পারবে যে, ওর ভেতরে কিছুই নাই—কেবল গুঁড়ো আছে মাত্র।

'কবীর চিট্ যো জামা চূণ্কা, বিরহা বৌরা খয়।
বিসরি গয়া যো স্বজনা, বেদন্ কাহু ন লয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দেহকে চূর্ণ করে খেয়ে গুঁড়ো করেছে।

যিনি বিরহতে পাগল, তিনি খান ঐ গুঁড়ো আর স্বামী যে ছেড়ে গেছেন তার কষ্ট কেউই ধরেন না।

'কবীর হাঁসে পিয়া নহি পাইয়ে, যিন্‌হ পায় তিন্‌হ রোয়।
হাঁসি খেলযো পিয়া মিলে, তো কোন্‌ দোহাগিনী হোয়া।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হাসতে হাসতে তাঁকে পাবে না। যিনিই পেয়েছেন, তিনিই কেঁদেছেন। হাসি-মস্করাতে যদি স্বামীকে পাওয়া যেতো, তাহলে আর দোহাগিনী (বিধবা) হবে কে?

'কবীর হাঁসি খেলযো পিয়া মিলে, তো কোন্‌ সহে খুর্‌সান।
কাম ক্রোধ তৃষ্ণা ত্যজে, তাহি মিলে ভগ্‌ওয়ান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হাসিখেলায় যদি স্বামীকে পাওয়া যেতো, তাহলে আর ক্ষুরের ধারের মতন সাধন কে করতো! কাম, ক্রোধ ও লোভকে ত্যাগ করলে তবে পাওয়া যায়।

'কবীর হাউস্‌ করে হরি মিলন্‌ কি, আও সুখ্‌ চাহে অঙ্গ্‌।
পীড়্‌ সহে বিনু পছমিনী, পুতন্‌ লেৎ উছঙ্গ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভগবান হরিকে পাবার ইচ্ছে হচ্ছে অথচ শরীরও সুখ চাইছে—যেমন স্ত্রীলোক প্রসব ব্যথার কষ্ট সহ্য করতে চায় না অথচ সন্তানকে চায় কোলে করতে।

'কবীর দেখৎ দেখৎ দিন গয়া, নিশতি দেখৎ যাহিঁ।
বিরহিনী পিয়া পাওয়া নহি, জীওয়ৎ রসে মন মাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দেখতে দেখতে দিন তো গেলো, রাতও ওরূপ যাবে। বিরহিনী স্বামীকে না পাওয়ার জন্য মনের মধ্যে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

'কবীর কি বিরহিনী কোঁ মীচদে, কি আপুহি দেখ্‌লায়ে।
আট প্রহর কা দাঝ না, মোঁতে সাহা ন যায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহিনীকে বুঝিয়ে দাও, তাহলে সে আপনিই দেখতে পাবে। বিরহযাতনায় অষ্টপ্রহর কান্না আর সহ্য হয় না।

'কবীর বিরহিনী থী তো ক্যা ভয়া, জ্বরিন্ পিয়া কো লার।
রহুরে মুগুধ গহে লরি, বিরহা লাজো মার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহিনী ছিলো, তাতে কী হলো। স্বামীর সঙ্গে এক হয়ে জ্বলে মরতে পারলে নাতো, বোকা বিরহিনী তুই মন্দ রাস্তায় যাচ্ছিস। তোর লজ্জা নেই, তবে নির্লজ্জা হয়ে মর।

'কবীর হোও যো বিরহ কি লকড়ি, সমুঝি সমুঝি ঘুঘুয়ায়।
দুঃখ সো তবহি' বাঁচি হো, যব্ সকলো জ্বরি যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহরূপ কাঠ থেকে থেকে জ্বলে। দুঃখ হতে তখন বাঁচবে যখন জানবে সে-সব জ্বলে গেছে।

'কবীর বিরহ অগিনি তন্ মো লাগি, গয়ে নয়ন্ জল্ শুখি।
আব্ দুতে বুঝে নহি, দোয় হাত্ কর কুকি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহরূপ অগ্নি শরীরে লেগে চোখের জল শুকিয়ে গেছে। ঐ অগ্নি নির্বাণ করার জন্য দু'হাতে জল ঢাললেও নির্বাণ হওয়া দূরে থাকুক্ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

'কবীর তন্ মন্ এ জ্বলা, বিরহ অগিনি শোগী।
মৃতক্ পীড়্ন জানই, জানে গিয়ো আগি।'

অর্থাৎ, যেমন মরলে আর জ্বালা-পীড়া থাকে না, তেমনি কবীর বলছেন, বিরহ শোকী ব্যক্তির শরীর-মন জ্বালিয়ে ফেললে কিন্তু সে জানতে পারলো না।

'কবীর প্রেম বিনা ধীরয় নহি, বিরহ বিনা বৈরাগ।
নাম বিনা যাওয়ে নহি, মন্ মন্ সাকো দাগ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেমছাড়া ধৈর্যধারণ করা যায় না। বিরহ ছাড়া হয় না বৈরাগ্য আর নামছাড়া মনের দাগ যায় না কিছুতেই।

'কবীর বিরহ কমোন্তল ভরি লিয়া, বৈরাগী দোয়ে নয়ন্।
পায়া দরশ্ মধুকরী, ছকি রহে রসনা বয়ন্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহরূপ কমণ্ডলু ভরে নেওয়ায় তখন দু'-

নয়নে বৈরাগ্য উদয় হয়ে ইচ্ছে গেলো চলে। এই অবস্থায় মধুকরীর দেখা পেয়ে জিব-মুখ ভরে গেলো আনন্দামৃতে।

'কবীর নয়ন্ হমারে বাওরে, ছিন্ ছিন্ লোটে তুঝ্।
না তু মিলে ন মৈ সুখী, য়্যাসে বেদন্ মুঝ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমার নয়ন হয়েছে পাগল। সে ক্ষণে ক্ষণে এদিকওদিক লুটিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছু না পেলেও সুখী হয় না অথচ ক্ষান্তও হয় না। কিছুতেই সুখী নই এমন বেদনা অথচ ছাড়তেও পারছি না।

'কবীর ফারি পটোরা ধ্বজা করোঁ, কাম্ লড়ি পহিরায়ে।
যোহি যোহি ভেক্ গিয়া মিলে, সোই সোই ভেক্ বনায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পট্টবস্ত্র ছিঁড়ে মাথায় ধ্বজা করো আর পরো কম্বল। যে যে ভেকে পাওয়া যাবে স্বামীকে, তাও করো অর্থাৎ অন্তরে সেই সেই ভেক করো।

'কবীর পরবৎ পরবৎ ম্যায় ফিরা, নয়ন্ গঁওয়ায়ে রোয়ে।
সো বুটী পাওয়ে নহিঁ, যাতে সর্জীবন হোয়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমি পর্বতে পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেঁদে কেঁদে চোখও নষ্ট করেছি। তথাপি পেলুম না মূল শিকড়। যার দ্বারায় মৃত্যুকে জয় করা যায়, তা পেলুম না।

'বিরহ তেজ্ তন্ মোর রহায়, অঙ্গ সভে অকুলায়।
ঘট্শূনো জীউও পিউ ওমো, মউৎ ঢুঁরি ফির যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমার শরীরে বিরহতেজ যা তাই রয়েছে। আর অঙ্গসমূহ যা আছে তারাও রয়েছে কাতর হয়ে। শূন্যপ্রায় হয়ে ঘট পড়ে আছে। তাতে জীব আছেন, কিন্তু জীব নিজের স্বামী নারায়ণেতে থাকার ফলে মৃত্যু শরীরে এসে জীবকে খুঁজে পেলো না।

'কবীর বেরা পায়া সরপ্কা, ভওসাগর কে মাহি।
যও ছেড়ে তও বুড়ি মরো, গঁহো তো ডছে বাঁহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভবসাগর মধ্যে পেয়েছি এক সাপের ভেলা। যদি ছেড়ে দিই তাহলে ডুবে মরি। যদি ধরি তাহলে কামড়ায় হাতে।

'কবীর নয়ন্ হমারে বিছোহীয়া, রহোরে শম্ম ম ঝুর।
দেওয়ল্ দেওয়ল্ মায় ফিরো, দেওছ উগা নহি সুর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমার নয়ন বিরহতেই আছে। একবার যা দেখেছিলো আর তা দেখতে না পেয়ে এখন খালি পড়ে আছে। আর আমি অনেক দেবতা দেবতা করে বেড়ালুম। দেখতে পেলুম না। অদৃষ্টক্রমে দিনও হলো না আর সূর্যও প্রকাশ পেলো না।

'কবীর গলো তুম্হারে নাম পর, যেঁা আটে মে লোণ।
য়্যাছা বিরাহা মেলি হো, নিৎ দুঃখ্ পাওয়ে কোন।'

অর্থাৎ কবীর বলছেন, ময়দাতে যেমন মিশে যায় লবণ তেমনি তোমাতে গলে যায় মন। এরূপ বিরহের পর মিলে গেলে আর নিত্য দুঃখ পাবে কেন?

'কবীর সুখীয়া সভ্ সংসার হায়, খাওয়ে শোওয়ে নিৎ।
দুঃখীয়া দাস কবীর হায়, জাগে সুমিরে চিৎ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই সংসার সকলেই প্রায় সুখী দেখছি, কারণ সকলেই নিত্য সুখে আহার করছে, নিদ্রা যাচ্ছে—এসব বিষয়ে সর্বদা রত। কিন্তু কবীরদাস বলছেন, কেবল একমাত্র আমিই দুঃখী কারণ আমি সর্বদা জেগে স্মরণ করছি ভগবানকে, পাছে ভুলে যাই।

'কবীর বিরহ জ্বালাই ম্যায় জ্বলো, জলতি জলহর যায়ও।
মহি দেখৎ জলহর জরে, সোতো কাঁহাঁ বুঝায়ও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহ জ্বালাতে জ্বলে গেছি। এখন আর আমার আমি নেই। যিনি আমাকে জ্বালাচ্ছিলেন, তিনিও জ্বলে গেছেন অর্থাৎ এক হয়ে গেছে। এখন জ্বালাও কোথায় নিভে

গেছে তার আর ঠিকানা নেই অর্থাৎ আছে কি নেই দেখবার লোক নেই।

'কবীর বিরহ জ্বালাই ম্যায় জ্বলোঁ, মুঝে বিরহ কা দুঃখ।
ছাহন বয়ঠৎ ডরপতি, মতি জ্বরি যাওয়ে রুখ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহদুঃখে আমি জ্বলে পুড়ে গেছি। বিরহদুঃখে আমাকে দুঃখিত করছে। কোথাও সুখ পাই না। ছায়াতে বসতেও ভয় করে পাছে আমার জন্য ছায়া পর্যন্ত জ্বলে যায়। বিরহের জন্যে কিছুতেই সুখ নেই।

কবীর বিরহিনী জ্বল্‌তি দেখ্‌ ময়, সাই আয়ে ধায়।
প্রেম বুন্দ্‌তে সিচি ময়, তন্‌ মে লয়ি মিলায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহিনীকে জ্বলতে দেখে ভগবান দৌড়ে এলেন। কারণ পাছে বিরহিনীর মৃত্যু ঘটে বিরহজ্বালায়। তিনি এসে প্রেমবিন্দু সিঞ্চন করে ঠাণ্ডা করে দিলেন। সেইসঙ্গে মিলিয়ে দিলেন নিজের শরীর। সুতরাং বিরহিনীর শরীরে আর লক্ষ্য রইলো না।

'কবীর ম্যায় বিরহিনী কে পীড়্‌মে, দাগ্‌ ন দিয়া যায়।
মাস্‌ গলি গলি চুঁই পড়া,.ম্যায় যো রহি গলে লায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিবহিনীর পীড়া দেখে দুঃখীত হলেন। বিরহিনীর শরীরের মাংস গলে খসে পড়ছে। এমন জায়গা নেই যে, কোন চিহ্ন দেন এ-অবস্থায়। আর কী হবে। তাঁর গলা জড়িয়ে থাকি।

'কবীর চারি পাওকে পলঙ্গ্‌ শো, চোলি লায়ো আগি।
যা কারণ এ তাত্তাকিয়া, সোই না গলে লাগি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, চার পায়ার পালঙ্গেতে শুলুম। কিন্তু তখন আগুন লেগে গেছে। যাঁর জন্য এত কষ্ট করলুম, তার গলা জড়িয়ে থাকতে পারলুম না অর্থাৎ এক হতে পারলুম না।

'কবীর কোয়ে কর কট্টোরিয়া, মুঠি কর গহি হাড়্।
যিছ্ পিঞ্জরে বিরহা বসে, মাসু কাঁহাঁরে ডাড়্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কূয়োকে বাটির মতন করে হাতে রাখলুম, কেননা কূয়ো হতে জল উঠানো কষ্টকর। শরীর দুর্বল, হাড় সার হয়েছে। বাটি থেকে জলপান করা সহজ। এমন অবস্থা হবার কারণ, যে শরীরে বাস করে বিরহ তাতে হাড় ছাড়া মাংস থাকে না।

'কবীর রক্ত্মাসু সভ্ ভছি গয়ে, নেকু ন কিন্ হো কাণ।
আর বিরহা কুকুর ভয়ে, লাগে হাড় চবান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শরীরের রক্তমাংস সব গেছে। কানও গেছে, ডাক শুনতে পাচ্ছি না। এখন বিরহ কুকুরের রূপ নিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে হাড়।

'কবীর বিরহা ভয়া বিছাওনা, ও ঢ়ণ্ বিপতি বিয়োগ।
দুঃখ শির হানে পাওঁ তে, কোন্ বনা সংযোগ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহই হয়েছে এখন বিছানা আর স্বামী বিয়োগরূপ চাদর গায়ে ঢাকা দিয়ে রয়েছি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুঃখ হানছে। সমস্তই বিয়োগ দেখছি। সংযোগ কোথায়?

'কবীর কোন্ জগাওয়ে ব্রহ্মকো, কোন্ জগাওয়ে জীউ।
কোন্ জাগাওয়ে সুরতি কো, কোন্ মিলাওয়ে পিউ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কে জাগাবে ব্রহ্মকে? কেইবা জীবের চৈতন্য করাবে? কেইবা সুন্দর রতিকে জাগাবে? আর কেইবা করিয়ে দেবে স্বামীর মিলন?

'কবীর বিরহ জাগাওয়ে ব্রহ্মকো, ব্রহ্ম জাগাওয়ে জীউ।
জীউ জাগাওয়ে সুরতি কো, সুরতি মিলাওয়ে পিউ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহই ব্রহ্মকে জাগাবে। ব্রহ্ম জীবকে জাগাবেন। আর জীব জাগাবেন সুন্দর ইচ্ছাকে। আর সুন্দর ইচ্ছাই মিলিয়ে দেবে স্বামীকে।

'কবীর ম্যায় তোম্‌কো ঢুঁরতে ফিরোঁ, তোম্ কাহে না
মিলিয়া রাম।
হিরদয়া মাহি উঠি মিলো, এহ সকল তোমারো কাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি কেন আত্মারামেতে মিলে থাক না? তুমি হৃদয়ের মধ্যে উঠে মিলে থাক? এ-সব তোমারি কাজ।

'কবীর বিরহ জাগাইয়া, পরি ঢঢোঁরে ছার।
ম্যায় কোই কোয়ালা উব্‌রে, জ্বারো ছুজি বার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহ জাগিয়ে দেওয়াতে বিরহের ঢ্যাড়া বেজে উঠলো। তখন বিরহ-অগ্নিতে সব ছাই হয়ে গেলো। আমি-স্বরূপ ময়লা থেকে গেলো। তাকে আবার ফেলো জ্বালিয়ে।

'কবীর তন্ মন্ যৌবন জ্বারিকে, ভসম্ যো করিয়া দেহ।
কহহিঁ কবীর এহ বিরহিনী, উঠিকে টটো হায় খেহ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দেহ, মন, যৌবন জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলেছে। কবীর বলছেন, এই বিরহিনী উঠে বলছে, এই অবস্থা যার দ্বারা ঘটেছে তার খেই কোথায়?

কবীর বিরহা সোতো হটি রহে, মনুয়া মেরা সুজান।
হাড়্‌মাস্ নখ্ ক্ষাৎ হায়, জীয়তে করে মশান্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হাড় মাংস নখ এসব বিরহ খাচ্ছে। সুবুদ্ধি মনকে ও জীবকে শ্মশানের মতো করে ফেলেছে।

'কবীর সো দিন ক্যায়সা হোয়েগা, রাম গহহিগে বাঁহি।
আপনা করি বৈঠাওসি, চরণ কঁওল্ ছাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সেদিন আমার কবে হবে, যেদিন রাম আমার হাত ধরে আপনার করে চরণকমলের ছায়াতে বসাবেন।

'কবীর অঙ্ক ভরি ভরি ভেটিয়া, মন নাহি বাধে ধীর।
কহে কবীর তে কো মিলে, যব্ লগি হোয়ে শরীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কোল ভরে তাঁকে দেখি কিন্তু মন তো স্থির

থাকে না। যিনি শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছেন, মনকে তিনিই পান।

'কবীর জীউ বিলম্বা পিউছো, অলক্ষ্ লক্ষ নহি যায়।
গোবিন্দ মিলে ন ঝলবুঝৈ, রহে বুঝায় বুঝায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জীব ব্রহ্মে গিয়ে লয় হলেন তখন অলক্ষ্য হয়ে গেলেন। আর লক্ষ্য করা যায় না। নিজেই নেই, লক্ষ্য করবে কে? সুতরাং অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করা যায় না। গোবিন্দকে পেলেই আগুন যায় নিভে। যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ জ্বালা নিবারিত হয় না, মনকে বুঝিয়ে রাখতে হয়।

'কবীর লক্ড়ি জরি কোয়লা ভেয়ি, মো মন অজহু আগি।
বিরহ কি য়োদি লকড়ি জরৈ, সুলাগি সুলাগি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কাঠস্বরূপ মন জ্বলে কয়লা হয়েছে, কিন্তু আমার মনে বিরহঅগ্নি লেগে রয়েছে। বিরহরূপ কাঠগুলি ভিজে হওয়ায় ধীরে ধীরে জ্বলছে।

'কবীর নিশু দাঝৈ বিরহিনী, অন্তর্ গত কি লায়ে।
দাস কবীরা কো বুঝৈ, সদ্গুরু গয়ে লাগায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দিনরাত বিরহিনী জ্বলে মরছেন বিরহজ্বালায়। যাঁর জন্যে জ্বলে মরছেন তিনি তো দূরে গেছেন। কবীরদাস বলেন, তাঁর যা হচ্ছে তা অপরে কী বুঝবে! যাঁর জ্বালা তিনিই জানেন। সৎগুরু লাগিয়ে দিয়েছেন এই বিরহাগ্নি।

'কবীর শুষৎ বড় রুখড়া, ম্যায় জন লতড়িয়া।
তেরে নাম বিলামিয়া, যেঁ্যা জল মহড়িয়া।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহ বড় শুকনো। শুকনো হলেও আমি লতার মতো তোমার নামেতে জড়িয়ে আছি, অথবা যেমন জলেতে থাকে মাছ।

'কবীর যো জন্ বিরহী নাম্কে, সদা মগন্ মন্ মাঁহ।
য্যো দরপণ কি সুন্দরী, কাহু ন পকরি বাঁহ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি নামের বিরহী তিনি সদাসর্বদা নিজের মনে মগ্ন হয়ে সেরূপ ভাবছেন আর সময় সময় ব্যাকুল হয়ে ধরতে যাচ্ছেন। কিন্তু পাচ্ছেন না—যেমন দর্পণের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, ধরা যায় না তেমনি।

॥ জ্ঞান ও বিরহ বর্ণনা ॥

'কবীর চিন্‌গি আগ্‌ কি, মো তন্‌ পরি উরায়।
তন্‌ জ্বরিকে ধর্‌তী জ্বরি, আওর জ্বরে বন্‌ রায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমার শরীরে একটু আগুনের ফিন্‌কি উড়ে উড়ে আমার শরীর জ্বালিয়ে মাটি পর্যন্ত জ্বলে উঠেছে। আর বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন যা, তাও পুড়ে গেছে।

'কবীর দীপক্ পাওয়ক আনিয়া, তেল ভরিয়া আসঙ্গ্‌।
তিনো মিলিকে জোইয়া, উড়ি উড়ি পড়ে পতঙ্গ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তেল ও আগুনে জ্বলে প্রদীপ। আর এই তিন জিনিসের একত্রে চেষ্টা করায় প্রদীপ জ্বলছে, কিন্তু অন্য আসক্তি হওয়ায় মনরূপ পতঙ্গ উড়ে পুড়ে মরছে।

'কবীর হির্দয়া ভিতর দো বারে, ধূয়াঁ না পরগট্ হোয়।
যাকি লাই সো লখে, কি যিন্‌হ লাই সংযোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হৃদয়ের মধ্যে জ্বলছে দুই অর্থাৎ দুই শিখা জ্বলছে। কিন্তু তার ধোঁয়া প্রকাশ হচ্ছে না। যাঁকে দেখার জন্যে তাকিয়েছিলুম তাঁকে পাচ্ছি না দেখতে।

'কবীর মারা হায় সো মরি গেয়া, ব্রহ্ম অগি কি ভাল।
মূরখ্‌ কোই জানে নেহি, চতুর লক্ষে সব্‌ খেয়াল।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ব্রহ্মাগ্নির বর্শা দিয়ে যাকে মারা হয়েছিলো তিনি গেছেন মরে। যারা মূর্খ, তারা কিছুই বুঝতে পারে না। চালাক লোক সব ভাব দেখেন।

'কবীর মারা হৈ মরি যায়েগা, বিনা সাঙ্গ্ কি ভাল।
পরা পুকারৈ বিরিদতর, আজু মরে কি কাল্হ।'

অর্থাৎ কবীর বলছেন, যাকে মারা হয়েছিলো তিনি তো মরে যাবেন। কারণ তাকে বিনা ফালের বর্শার দ্বারায় মারা হয়েছিলো। তিনি গাছের তলায় পড়ে চীৎকার করছেন। আজ-কালের মধ্যে মরবেন।

'কবীর চোট্ সন্তাওয়ে বিরহ কি, সভ্ তন্ ঝঁজর হোয়।
মারনি হারা জান্ছি, কি যিস্ লাগায়ে হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহীর কষ্ট হচ্ছে অনেক। সমস্ত দেহ হয়ে গেছে ঝাঁজরার মতো। যিনি মারেন, তিনিই জানেন। আর এই যন্ত্রণা যার জন্যে তিনি তো শুয়ে আছেন।

'কবীর ঝল্ উঠি সকলো জ্বরা, খপর ফুটা সঞ্জুত।
হংসা যোগী রমী গেয়া, আসন্ রহি বিভুত।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ব্রহ্মাগ্নির ঝলকা উঠে সব জ্বলে গেছে। মাথার খাপরখানাও ফেটে জ্বলে গেছে। হংসরূপ যোগী আত্মায় রমণ করছিলেন। তিনি গেলেন চলে। পড়ে রইলো আসন আর বিভূতি।

'কবীর আগি লাগিনী রমে, কাঁদো জ্বরিয়া ঝারি।
উত্তর দখিণ্ কা পণ্ডিতা, মরে বিচারি বিচারি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জলে আগুন লাগার জন্যে জলও জ্বলে গেছে, কাদাও জ্বলছে। যারা তার্কিক পণ্ডিত, তারা উত্তর-দক্ষিণের বিচার করে মরছে।

'কবীর দ্বৌ লাগি সায়ের জ্বরা, মচ্ছি জ্বরিয়া আয়।
দাধে জীব ন উবরে, সদ্গুরু গয়ে লগায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ত্রুটির জন্যে জলাশয় জ্বলেছে। তাতে মন-স্বরূপ যে মাছ ছিলো, তাও গেছে পুড়ে। সৎগুরু উপদেশ লাগিয়ে দিয়েছেন। দগ্ধ জীব তিনি থেকে গেছেন।

'কবীর গুরু দগ্ধা চেলা জ্বলা, বিরহ জাগায়ি আগ্ ।
তিনুকা বাপুরা উবরা, গুরু পূরে কি লাগ্ ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গুরুও জ্বলছেন, শিষ্যও গিয়েছেন পুড়ে। আর বিরহরূপ আগুন তাও জেগে রয়েছে। সৎগুরু যিনি তিনি যখন লাগিয়ে দিলেন, তখন তিনজনেই উঠে করতে লাগলেন।

'কবীর আহরি সঙ্গ লাগিয়া, মৃগা পুকারৈ রোয় ।
যেহি বন হাম ক্রীড়া কিয়া, দাবৎ হায় বন সোয় ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ব্যাধের সঙ্গে মিলে মৃগ রোদন করছে উচ্চৈ-স্বরে। সে এই বলে রোদন করছে, যে-বনে খেলা করতুম হায় সেই বন দগ্ধ হচ্ছে।

'কবীর মৈ ঘর জ্বারা আপনা, লিয়া লুকায়া হাথ্ ।
অর ঘর জ্বারো তাহিকা, যো লগৈ হমারে সাথ্ ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, নিজের হাতে মশাল ধরে নিজের ঘর নিজেই জ্বালিয়েছি আর অপরেরও ঘর জ্বালিয়ে দেব, যিনি আমার সঙ্গ নেবেন।

'কবীর পট্টন শারী জ্বর গেয়া, ধাগা এক না দাধ ।
ঘর সিঁরি, পগ্রী কষা, পরা কুটুম বাধ্ ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পট্টবস্ত্র যা কিছু ছিলো তাতো গেলো জ্বলে। একটাও তার সুতো নেই। ঘরের মধ্যে যে সিঁড়ি আছে তার দ্বারা উঠে পর যে কুটুম্ব তাদের আসার বাধার জন্যে পাগড়ী বাঁধবো কষে।

'কবীর ঘর জ্বারে ঘর উবরে, ঘর রাখে ঘর যায় ।
এক আচম্‌কা দেখিয়া, মুয়া কাল্‌কো খায় ।'

অর্থাৎ, ঘর জ্বালালে শ্রীবৃদ্ধি হয় ঘরের আর ঘর রাখলেই ঘর যায়। এক আশ্চর্য দেখলুম, যে মরে গেছে সে কালকে খেয়ে ফেললো।

'কবীর সোর়্ঠা সমুন্দর্ লাগি আগি, নদীয়া জ্বারি কয়লা ভয়ি ।
দেখ কবীরা জাগি, মচ্ছি তরিওয়র্ চোরি গেয়ি ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সমুদ্রে লেগেছে আগুন আর নদী জ্বলে হচ্ছে কয়লা। মাছ গাছের ওপর চড়ে গেলো। এই দেখে জাগলো কবীর।

'কবীর আগে আগে দ্বৌ বারে, পাছে হরিয়রা হোয়।
বলিহারি উয়া বৃছ্ কি, ঘা জরি কাটে ফল হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আগে দু'টি জ্বলছে। পেছনে সবুজ রং হয়, এমন বৃক্ষের বলিহারি যাই—যার শেকড় কেটে দিলেও ফল হয়।

'কবীর বিরহ ফুল্ হাড়ি তন্ বহৈ, খাও ন বাধৈ রোহ।
মরণে কি শংসৈ নহি, ছুটী গয়া ভরম্ মোহ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহরূপ কুড়ুল সমস্ত শরীরে বহে যাওয়ায় অর্থাৎ লাগছে, মরবার জন্যে সংশয় নেই, সব ভ্রম, মোহ দূর হয়ে গেছে।

'কবীর স্বপনা রৈণকা, পরা করে যে ছেক্।
যব্ শোয়ো তব্ দুই জনা, যব্ জাগে তব্ এক্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাতে স্বপ্ন দেখে হৃদয়েতে এসে লাগলো, যখন শুয়েছিলো তখন দু'জন। যখন জাগলো তখন একজন।

'কবীর পাণি মাহি পর জ্বলি, ভয়ি অপর্বল্ আগি।
সরিতা বহতি রহি গেয়ি, মীন্ রহে জল্ ত্যাগি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জলের মধ্যে মাছ রয়েছে। তার ডানা গিয়েছে জ্বলে। আগুনের আর জোর নেই। নদী বইতে বইতে স্থির হলো আর মাছ জল ত্যাগ করে রইলো।

'কবীর ব্রহ্ম অগ্নি তন্ মো লাগি, লাগি রহা তত জীউ।
কি জানে ওহ বিরহিনী, কি জানে ও পিউ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ব্রহ্মাগ্নি লাগলো শরীরে আর জীব তিনি লেগে রইলেন। হয়তো সেই বিরহিনী জানে অথবা জানে সেই স্বামী।

'কবীর পাওয়ক্ রূপী রাম হ্যায়, সব্ ঘট্ রহা সমায়।
চিৎ চক্‌মক্ চিন্ হটায় নহি, ধুঁয়া হোয় হোয় যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাম যিনি তিনি অগ্নিরূপী সকল ঘটেতেই আছেন সমানভাবে আর চিত্তরূপী চক্‌মক্ যিনি তিনি চলে যান ধোঁয়ার মতো।

'কবীর কর্‌কায়া চক্‌মক কিয়া, ঝারা বারম্বার।
তিনবার ধুঁয়া ভয়া, চৌথে পরা অঙ্গার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কায়াকে চক্‌মক্ করে বারংবার ঠুকেছি। তিনবার ধোঁয়া হয়েছে, চারবারের বার হলো অঙ্গার।

'কবীর পহিলেঁ প্রেম ন চাখিয়া, মুঝে নিরাশী আয়।
পাছেঁ তন্ মন্ হাত লয়, গয়ে চম্‌কা লায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রথমে প্রেমের আস্বাদন না পাওয়ায় নিরাশ হলুম। পরে শরীর ও মন কায়দা করার ফলে এক চমৎকার দেখলুম।

'কবীর বিরহা মুঝসোঁ এওঁ কহে, গাড়া পাকরো মোহি।
চরণ্ কমল কে মোজ্‌মে, লৈ বয়ঠাযোঁ তোহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিরহ আমাকে এও বলেছে, আমাকে ভালো করে ধরো। তাহলে চরণকমলের মজাতে বসিয়ে দেবো তোমাকে নিয়ে।

'কবীর আগুয়ানী তো আইয়া, জ্ঞান, বিচার, বিবেক।
পাছে হরিভি আইয়া, সগরি সাজ সমেত।'

অর্থাৎ কবীর বলছে, যাঁরা অগ্রগামী তাঁরা এসেছেন—জ্ঞান, বিচার ও বিবেক। তারপর সমস্ত সাজসজ্জাসহ হরিও এলেন।

॥ পরিচয়ের বিষয় ॥

'কবীর তেজ অনন্ত্‌কা, য্যায়সা সূরুয্ শয়ন।
পতি সঙ্গ্‌জাগি সুন্দরী, কৌতুক দেখৎ নয়ন।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, অনন্ত ব্রহ্মের তেজ কেমন? যেমন সূর্যের

শয়ন অর্থাৎ সূর্য অস্ত গেলে পর, না-তেজ না-অন্ধকার। খালি প্রকাশমাত্র থাকে। তেমনি সুন্দরী স্ত্রী পতিসঙ্গ অবস্থায় জেগে থাকার জন্য নয়ন দেখতে থাকে কৌতুক। অর্থাৎ পতি উপস্থিত হওয়ার জন্য স্ত্রীর মনে অনুভূত হয় আনন্দ। তখন নয়নও দেখতে থাকে পতির দৃশ্য। এরকম সাধকের হয়ে থাকে।

'কবীর পারব্রহ্মকে তেজকা, ক্যায়সা হায় অনুমান।
ক্যা ওয়াকি শোভা কহোঁ, দেখন্ কি পর্‌মাণ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পরব্রহ্মের তেজের অনুমান কী প্রকার হতে পারে, ওর শোভা কী বর্ণনা করবো, প্রত্যক্ষ না দেখলে বুঝতে পারা যায় না।

'কবীর অগম্ অগোচর গমি নহি, তাঁহা ঝলকে জ্যোতি।
তাঁহা কবীরা বন্দোগি, পাপপুণ্য নহি দ্বোতি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সেখানে যাওয়া যায় না। কোনো ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়, বুদ্ধি সেখান পর্যন্ত যেতে পারে না। সেখানে জ্যোতি দেদীপ্যমান। সেখানেই কবীর গিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন, সেখানে নেই পাপ-পুণ্য রূপ দ্বৈতভাব।

'কবীর মন্ মধুকর্ ভয়া, কিয়া নিরন্তর বাস।
কঁওল যো ফুলা নির্‌বিচ, ঐ নিরখে নিজ দাস।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি মন তিনি হয়েছেন মধুকর। আর নিরন্তর বাস করছেন সেখানে, যেখানে কমলস্বরূপ তত্ত্বগুলি হয়েছে প্রস্ফুটিত। ওটি যিনি নিজের দাস তিনিই দেখেন অর্থাৎ আত্মার দাস যিনি তিনিই দেখেন।

'কবীর ছিপ্ নেহি সাগর নহি, স্বাতি বুন্দ্ ভি নাহি।
কবীর মতি নিপ্‌জে, শূন্য শিখর্ গড়্ মাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সমুদ্রও নেই ঝিনুকও নেই। নেই স্বাতি-নক্ষত্রের জলবিন্দু। অথচ শূন্য মণ্ডলের মধ্যে একটি বিন্দুস্বরূপ মতি দেখা যাচ্ছে।

'কবীর ঘট্‌মে আওঘট পাইয়া, আও ঘটয়েঁ। হি ঘাট।
কহে কবীর পর্‌চে ভয়া, গুরু দেখাই বাট।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ঘটের মধ্যে একটি অঘট পেয়েছি। এখন অঘটকেই ঘাট বলে জেনেছি। কিন্তু গুরু যখন রাস্তা দেখিয়ে দিলেন, কবীর বলেন, তখনি সব জানতে পারলুম।

'কবীর যাঁহা মত্তিছকি ঝাল্‌রী, হীর্‌হুকো পরগাশ।
চাঁদ সূর্য্য কি গমি নহি, তাঁহাঁ দরশন্‌ পাওয়ে" দাস।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যেখানে ঝুলছে মতির ঝালর আর প্রকাশ পাচ্ছে হীরের মতো জ্যোতি, সেখানে চন্দ্র-সূর্যেরও যাবার উপায় নেই। এমন জায়গায় যাবার একমাত্র উপায়, যিনি দাসভাব অবলম্বন করতে পারেন অর্থাৎ নিজেকে ছোট ভাবতে পারেন তিনিই দেখা পান। অহংকারী মানুষ দেখা পান না।

'কবীর সূর্য্যসমানা চাঁদ্‌মে, দ্বৌ কিয়া ঘর্‌ এক্‌।
মনকো চীতয়ো গয়া, পূর্ব্ব জনম্‌কা লেখ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের মিলনে হু'ঘর এক করে ফেললেন। মনেরও চঞ্চলত্ব ঘুচে গিয়ে চৈতন্যোদয় হওয়ার দরুন আগের জন্মেরও যাকিছু ছিলো, তাও গেলো মিটে।

'কবীর পিঞ্জর প্রেম প্রগাশিয়া, অন্তর্‌ রাহা উজাস।
মুখ্‌ কস্তুরি মহ মহি", বাণি ফুটি সুবাস।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেমরূপ পিঞ্জর প্রকাশ হলো বটে কিন্তু তা অন্তরেই জানতে পারা গেলো। যেমন মুখের মধ্যে কস্তুরি রাখলে অপরে তার সুগন্ধ পায় না, কিন্তু যখন কথা বলে তখুনি বেরোয় সুবাস।

'কবীর যোগী হুয়ে যক্‌ লাগি, মেটি গেই ঐ চাতান।
উলটি সমানা আপুমে, হোয় গয়া ব্রহ্ম সমান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যোগী হয়েছি কিন্তু যকের মতন। ইচ্ছাও গেছে মিটে। আপনাতে উল্টোভাবে থেকেও ব্রহ্মের তুল্য হয়ে গেছি।

'কবীর কছু করনী কছু কর্ম্মগতি, কছু পূর্ব্বিলা লেখ্।
দেখো ভাগ্ কবীর কা, কিয়া দোস্ত আলেখ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কিছু করেছি ও কিছু হয়েছে কর্ম্মসূত্রের গতিতে। আর আগের জন্মের যা লেখা ছিলো তাতেও যাকিছু করে এসেছি। এখন কবীরের ভাগ্য দেখো, আলেখের (ভগবানের) সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন।

'কবীর কায়া ছিপ্ সঁসার মে, পানি বুঁদ শরীর।
বিনা ছিপ্ কি মোতি, প্রগটে দাস কবীর।'

অর্থাৎ কবীর বলছেন, কায়ারূপ ঝিনুক এই সংসারময় হচ্ছে। আর জলরূপ বিন্দুই শরীর। কবীরদাস বিনা ঝিনুকে মতি প্রকাশ করছেন।

'কবীর য়োহ মতি যনি জানহু, যো গোওয়ে পোনি সাথ।
এহ তো মোতি শব্দকি, যো বেধি রাহা সভ্ গাত।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ওরূপ মতি তুমি জেনো না। এরূপ মতি করো যে, মতি শব্দেতে হচ্ছে অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনিত হচ্ছে। যা সমস্ত শরীর ভেদ করে হচ্ছে তাতে মতি করো। কুমতিকে পাকান রুটির মতো খেয়ে ফেলো।

'কবীর মন লাগা উন্মুনী সোঁ, গগণ্ পহুচা যায়।
চাঁদ বিহুনা চাঁদনা, তাঁহাঁ অলখ্ নিরঞ্জন রায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মন যখন উন্মনীতে লেগে গেলো তখন শূন্য ব্রহ্মে যাওয়া যায় আর যেখানে চাঁদ নেই অথচ জ্যোৎস্না আছে অর্থাৎ প্রকাশ আছে সেখানেই রয়েছেন ব্রহ্মনিরঞ্জন।

'কবীর মন লাগা উন্মুনী সোঁ, উন্মুন্ মনহি বিলগ্।
লোণ বিলগা পানিয়া, পানি লোণ মিলগ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মন যখন উন্মনীতে লেগে গেলো, উন্মনীতে মন যাওয়ায় মন হয়ে গেলো পৃথক। যেমন জল লবণ হতে পৃথক হলো, আবার জল লবণে গেলো মিলে।

'কবীর পানিহুঁতে পুনি হেম ভয়া, হেমো গেয়া বিলায়।
কবীরা যো থা সোই ভয়া, আব কছু কহা না যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পুনরায় জল হয়ে গেলো সোনা। সোনাও আবার মিলিয়ে যায়। কবীর বলেন, যা' ছিলো তাই হলো, এখন আর কিছু বলার উপায় নেই।

'কবীর সুরতি কঁওল মে বইঠ্‌কে, অমী সরোয়র্‌ চাখ।
কঁহে কবীর বিচার কৈ, তব শন্ত বিবেকী ভাখ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সুন্দর ইচ্ছারূপ কমলে বসে অমৃতরূপ সরোবর-রস আস্বাদন করো অর্থাৎ চাখ। কবীর সাহেব বিচার করে বলছেন, তা কেবল শান্ত বিবেকী লোকেরাই পারেন অপরে নয়।

' কবীর অধর কঁওল্‌কে উপরে, পরিমল্‌ শ্বেৎ সুবাস।
অমী কঁওয়ল্‌ পর বইঠিকে, দরশন্‌ দরশ্‌হু লাস।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, অধরকমলের ওপরে সুন্দর সুগন্ধযুক্ত শ্বেত-বস্ত্রের মধ্যে অমৃত কমলের ওপর বসে অলৌকিক রূপ দর্শন করে উল্লাস হতে লাগলো।

'কবীর অবিগৎ কি গতি ক্যা কহোঁ, যাকে গাঁও ন ঠাঁও।
গুণ্‌ বিহুনা দেখিয়ে, ক্যা কহি ধরিয়ে নাও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যার গতি নেই তার গতির বিষয় কী বলবো। যার কোনো গ্রামও নেই, কোনো ঠাঁইও নেই আর গুণ-বিহীনও দেখা যায় এরূপ জায়গায় তার কী নাম বলবো!

'কবীর ওয়াকি গতি আস্‌ অলখ্‌ হায়, অলখ্‌ লখা
নেহি যায়।
শব্দস্বরূপী রাম হায়, সর্ব ঘাট রহা সমায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তাঁর গতি লক্ষ্য হয় না। অলক্ষ্য লক্ষ্য হবে কীভাবে! ওঁকারস্বরূপই রাম। ওঁকার শব্দ স্বরূপ হয়ে প্রত্যেক ঘটে রয়েছেন।

'কবীর যেঁহি কারণ্ হাম যাৎথে, সোই পায়া ঠাওর।
সো তো ফেরি আপনা ভয়া, যাকো কহতে আওর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে-কারণে আমি যাচ্ছিলুম তার ঠিকানা ঠাওর পেলুম। যাকে পৃথক ভাবতুম, তিনিও নিজের হয়ে গেছেন।

'কবীর মায় জানো যো মিলোঙ্গে, কোই আওর রামকো ধায়।
আপু রমৈয়া হোই রাহা, শীষ নোওয়াও কায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আগে যদি জানতুম আপনাতে আপনি মিলতে হবে, তাহলে আর অন্য রামের জন্যে ধাবিত হতুম না। যখন আপনাতে আপনি রমণ করে রামই হয়েছি, তখন মাথা নোয়াব কোথায়!

'কবীর মটুক্ মনোহর্ অধিক্ ছবি, ভেদ না পাওয়ে কোয়।
বঙ্কনলকো সম করৈ, গুরুগম্ কহিয়ে সোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মুকুটের চেয়ে অধিক মনোহর ছবি আছে, কিন্তু তার ভেদ পায় না কেউ। যিনি জীব্‌কে সর্বদা সমান রাখেন (একে গুরুগম্য বলে) অর্থাৎ গুরুমুখে সমস্ত জানা যায়। নচেৎ জানবার উপায় নেই।

'কবীর যাঁহা পওন নাহি সঞ্চারে, তাঁহা রচি একগ্রহ।
অচরয্ ফক যো দেখিয়া, সিঁদ্ধ কলেজা দেহ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যেখানে পবনেরও সঞ্চার হয় না সেখানে রচনা করেছি একটি ঘর। কিন্তু এক আশ্চর্য দেখছি যে, হৃদয়ের ও শরীরের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে। অর্থাৎ হৃদয়ের নেই ধক্-ধকানি।

'কবীর ঢাড়স্ দেখো চকোর কি, সিঁদ্ধ কলেজ্ দিন্‌হ।
হির্দয়া ভিতর পৈঠিকে, লাল রতন্ হরি লিন্‌হ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, চকোরের সাহস দেখো। হৃদয়ের কলিজায় সিঁধ দিল। হৃদয়ের ভেতরে বসে লাল রত্ন হরণ করে নিলো।

'কবীর অলখ্ লখে লালচ্ লগো, কহত্ বনে নহি বয়ন্।
নিজ মন ধসো স্বরূপমো, সদ্গুরু দিন্হে শয়ন্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, অলক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য করে লোভ হচ্ছে। তা আর কথায় বলা যায় না। কারণ তখন নিজের মন লেগে রয়েছে স্বরূপেতে। সৎগুরুই দেখালেন এই স্মরণ।

'কবীর উন্মন্ লাগি শূন্যমো, নিশুদিন্ রহে গুল্ তাঁন।
তন্ মন্ কি কছু সুধি নহি, পায়া পদ্ নির্ব্বাণ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, উন্মনীতে লেগে যাওয়ায় শূন্য দেখতে লাগলুম। তখন দিনরাত গলায় টান ধরে আছে, শরীরের ও মনের জ্ঞান নেই। এমন অবস্থায় পেলুম নির্বাণপদ।

॥ অস্থিরতার বিষয় ॥

'কবীর প্যায়লা প্রেমকা, অন্তর্ লিয়া লগায়।
রোম্ রোম্ মে রমি রহো, অমল্ ন আওর সো হায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেমের পেয়ালা অন্তরে গিয়ে লেগেছে। অন্তরে লাগায় প্রতি লোমে লোমে করছে রমণ। আর ঐ অবস্থা যত অন্তরে হয় ততই হয় আনন্দ।

'কবীর হরিরস্ এয়ো পিয়া, বাকি রহিম ছাক।
পাকা কলস্ কো ভারকা, বহুরি চড়ে নহি চাক।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হরি-রস যে একবার পান করেছে তার আর কোন রসের শখ থাকে না, যেমন পোড়া কলসি পুনরায় আর চড়ে না কুমোরের চাকে।

'কবীর রাম রসায়ন্ অধিক রস, পিয়োতো অধিক রিসাল।
কবীর পিয়ন্ সো দুর্লভ হায়, মাগে শীষ্ কলাল।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাম রসায়নের অধিক রস। যদি পান করো তাহলে অধিক রসাল হবে। কিন্তু তা পান করা বড় দুর্লভ। কারণ

তা পান করতে হলে মাথা কাটা চাই অর্থাৎ অহংজ্ঞান করতে হবে নাশ।

'কবীর ভাঁটি প্রেম কি, বহুতক্ বৈঠে আয়।
শির সোপে পিওরে সোয়, আওর সো পিয়া ন যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভাঁটির প্রেম অনেকক্ষণ বসলে আসে অর্থাৎ অনেক সাধন করলে হয়। এও আবার যিনি মাথা দিতে পারেন তিনি পান করতে পারেন। অন্য উপায়ে পান করতে পারা যায় না।

'কবীর হরিরস্ মহঘ্যা জানিকৈ, মাগে শীষ্ কলার।
দিল্ য়োছা ঘন্ট্ দুব্লা, বৈঠিকে গাওয়ে মালার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হরিরস বড় দুর্মূল্য জানবে। হরিরস চাইলে আগে মাথা দিতে হয়। শরীর দুর্বল, হৃদয়ও মন্দ। সুতরাং এখন বসে মল্লার রাগিণীতে গান করছে।

'কবীর হরিরস মাহঙ্গে পিয়তা, ছোড়ি জীওয়ন্কি বাণ।
মাথা সাটে সাই মিলে, তও লাগি সুলভ্ জান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হরিরস বড় দুষ্প্রাপ্য। তা যদি পান করতে চাও তাহলে জীবনের আশা দাও ছেড়ে। তবে যদি মাথা কেটে দিতে পার তাহলে একদিন সাঁই (কর্তা) মিলবে। তখন হবে সুলভ।

'কবীর অপধূতা আবি গতিরতা, য্যায়সা অখিল্ অজিৎ।
নাম অমল্ মাতারহে, জীওয়ন্মুক্তি অতীৎ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি অবধূত তাঁর গতি হয়েছে রহিত। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর আর জয় করবার ইচ্ছে হয় না অর্থাৎ ইচ্ছাশূন্য হয়ে গেছেন। আর কাকেই বা জয় করবেন। জয় করবার জিনিস বা আর কী আছে। আর অমল নামেতে মত্ত হয়, অমল হয় মতি, তা জীবনমুক্ত অবস্থা হতেও অতীত জানবে।

'কবীর আট গাঁট্ কোপীন্মে, মনহি না আনে শঙ্ক।
নাম অমল্ মাতা রহে, কাঁহা রাজা কাঁহা রঙ্ক।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কৌপীনে আটটি গাঁট রয়েছে আর মনেও কোন শঙ্কা আসে না। সদাই মত্ত থাকেন অমল নামেতে। এ অবস্থায় রাজাই বা কে, ফকীরই বা কে?

'কবীর হরিরস পিয়া তর জানিয়ে, উতরে নেহি খোঁয়ারি।
মতোয়ালা ঘুমৎ ফিরে, তন্ কি নাহি সমারি।'

অর্থাৎ, কবীর তখনি হরিরস পান করেছে জানবে, যখন নেশায় ছাড়ে না খোঁয়ারি। মাতালের মতো ঘুরে বেড়ায় অথচ খেয়াল নেই শরীরের প্রতি।

'কবীর যোঁহ সর্ ঘড়া ন ডুবতা, ময়গল মলিমলি নাহায়।
দেওল্ ডুবা কলস্ সো, পরখৎ সাঁই যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সরোবরে ঘড়া ডুবে না অথচ শরীর মলে মলে স্নান করছে। আবার মন্দিররূপ শরীর ও কলসরূপ মস্তক ডুবে গেলো। দেখতে গেলেই চলে যায়, আর দাঁড়ায় না।

'কবীর সভে রসায়ন্ মায় কিয়া, হরিরস্ আওয়র ন কোয়।
রঞ্চক্ ঘট্‌মে সঞ্চরে, সব্ তন্ কাঞ্চন্ হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমি সমস্ত রকম রসায়ন করেছি কিন্তু যদি কিঞ্চিৎমাত্র হরিরস ঘট্‌রূপী শরীরে প্রবেশ করে তাহলে সমস্ত শরীর হয়ে যায় সোনা। কিন্তু তা হরিরস ছাড়া অন্য কিছুতেই সোনা হয় না শরীর।

'কবীর একস্থ ছাক ছকাইয়া, একস্থ পিয়া ধোয়।
কল্ কলন্তি ভাঠি যিন্ হ পিয়া, রাহা কাল লেঁ শোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, একবার ছেঁকে একবার ধুয়ে পান করার পর আবার ভাঁটিতে যা কল্ কল্ করছে তা যে পান করে সে কালের সঙ্গে শুয়েছে।

'কবীর কহৎ শুনৎ জগ্ যাৎ হায়, বিখয়ণ্ শুঝে কাল।
কহেঁ কবীর রে প্রাণিঁয়া, বাণি ব্রহ্ম সঁভাল।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বলতে বলতে আর শুনতে শুনতে জগৎ চলে

যাচ্ছে। বিষয়রূপ বিষে কালকে দেখতে দিচ্ছে না। কবীর তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, রে প্রাণিগণ! ব্রহ্মের বাক্য অর্থাৎ ওঁকার-ধ্বনি যা হচ্ছে তা সামলাও অর্থাৎ ধরে রাখো।

'কবীর রতো মাতা নাঁম কা, পিয়া প্রেম অঘায়।
মতওয়ালে দিদারকে, মাগে মুক্তি বলায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, নামেতে রত হয়ে মেতে গেলো। প্রেমামৃত গলায় গলায় পান করার জন্যে মাতাল হলো। তখন তিনি মুক্তিকে অগ্রাহ্য করে বললেন, মুক্তি! যে আমার শত্রু সে নিক, আমার দরকার নেই।

'কবীর রতো মাতা নামকা, মদ্‌কা মাতা নাহিঁ।
মদ্‌কা মাতা যো ফিরে, সে মাতওয়ারা নাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, নামেতেই যুক্ত হয়ে মেতেছে। মদের মাতাল নয়, মদ খেয়ে যে মাতাল হয় সে-মাতালের কথা বলছেন না। এ হচ্ছে কাজের মাতাল। এ মাতাল এলোমেলো বকে না। চুপ করেই থাকে অর্থাৎ আপনাতে আপনি থেকে মাতাল হয়ে গেছে।

'কবীর মতওয়ালা ঘুমৎ ফিরে, রোম রোম ভরিপূর।
ছোটে আশ্‌ শরীর কি, তব দেখে দাস হজুর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি মাতাল তিনি বেড়াচ্ছেন ঘুরে ঘুরে। কিন্তু প্রতি রোমে রোমে পরিপূর্ণভাবে তেজ রয়েছে। যখন শরীরের আশা মিটবে তখন দাস যিনি তিনি হজুর অর্থাৎ কর্তাকে দেখতে পাবেন।

'কবীর প্রেম পিয়ালা ভরি পিয়ো, জর্‌ না করো যতন্‌।
আয়ো ছাক যব্‌ জান্‌সি, সোহাগে ধরা রতন্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রেমরূপ পেয়ালা ভরে পান করো আর তা পান করতে কোনো যত্ন করছো না? যখন ছেঁকে জানতে পারলে তখন রত্নস্বরূপ কূটস্থকে ধরে থাকো।

'কবীর ভৌঁরা বারি পরিহরি, মড়ি বিলন্‌মে আয়।
পাওয়ন্‌ চন্দন্‌ ঘর, কিয়ো, ভুলি গায়া বনরায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ভ্রমর জলীয় উদ্যান ত্যাগ করে গর্তে এসে রয়েছে। পবিত্র চন্দনের ভেতর ঘর করে বনের যিনি রাজা তাঁকে গেছে ভুলে।

'কবীর অমৃৎ ফেরি, রাখি সদ্‌গুরু ছোরি।
আপু সরিখা যো মিলে, তাহি পিয়াওয়ে ঘোরি।

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি সৎগুরু তিনি অমৃতকে রেখেছেন পৃথক করে। যদি আপনার সমান লোক পান তাহলে তাকে ঘুলিয়ে খাইয়ে দেন।

'কবীর, অমৃৎ পিয়ে সো জনা, যাকে সদ্‌গুরু লাগে কাণ।
ওয়েতো অগোচর মিল্‌ গয়, মন নহি আওয়ে আন।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, অমৃত তিনিই পান করেন যাঁর কানের কাছে লেগে রয়েছেন সৎগুরু। তিনিই অগোচর বস্তু লাভ করেছেন। তখন মন আর অন্যদিকে যায় না।

'কবীর সাধু ছিপ্‌ হায়, সদ্‌গুরু স্বাতি বুন্দ্‌।
তৃখা গেই এক্‌ বুন্দ্‌তে, ক্যা লে করে সমুন্দ্‌।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সাধুই হচ্ছেন ঝিনুকস্বরূপ। আর সৎগুরু স্বাতি নক্ষত্রের বিন্দুস্বরূপ। যত তৃষ্ণা ছিলো সব এক বিন্দুতে গেলো। এখন আর সমুদ্র নিয়ে কী হবে!

॥ লোকো অর্থাৎ অবস্থা বিশেষ বিষয় বর্ণনা অর্থাৎ সাধনার একটি অবস্থা বিশেষ—যে-অবস্থায় এলে বা স্থির হলে যে-লোক লাভ হয় আর সেই মহাপুরুষের যে-সব চিহ্ন হয় ॥

'কবীর কায়া কওগুল্‌ ভরি লিয়া, উজল্‌ নির্ম্মল্‌ নীর।
পিয়ৎ তৃখা ন ভাজই, তিরিখাবন্ত্‌ কবীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, শরীররূপ কমণ্ডলুতে ভরে নিয়েছি উজ্জল

নির্মল জল। তা পান করে তৃষ্ণান্বিত কবীরের তৃষ্ণা মিটলো না।

'কবীর মন উল্টা দরিয়া মিলা, লাগা মলি মলি স্নান।
থাহৎ থাহ ন পাইয়া, তিরিখা রহি অমান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মন উল্টো স্রোতের নদী পেলেন। তাতেই লেগে মলে মলে স্নান করতে লাগলেন। কিন্তু তার থই পেলেন না। অথচ তৃষ্ণা যেমন তেমনি রয়েছে।

'কবীর পণ্ডিৎসে তি কহি রাহা, কাহা না মানে কোয়।
আও গাহা এহ কো কহে, ভারি আচরয হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পণ্ডিতকে তা বলেছিলুম কিন্তু কেউই আমার কথা মানে না। আর এসো এও যদি কেউ বলে তাতেই তারা ভারি আশ্চর্যান্বিত হয়।

'কবীর জোরে বসে এহ তন্ মহ, তা গতি লখে ন কোয়।
কহে কবীরা শন্ত জন, বড়া আচম্ভা হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি জোর করে এই শরীরের মধ্যেই বসেন তার গতি কেউ দেখেঁন না। কবীরসাহেব বলেন, কেবল সন্তজনেরা তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হন।

'কবীর ঘট্‌মে রহে শুঝে নহি, করণ্ সোঁ শুনা ন যায়।
মিলা রহে আও ন মিলে, তা সোঁ কহে বসায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই ঘটের মধ্যেই রয়েছে অথচ কেউ বোঝে না। কানের দ্বারায়ও শোনা যায় না। মিলে রয়েছে অথচ তাতেও কেউ মেলে না। এমন অবস্থায় কীভাবে তাকে স্থির করে বসাবে!

'কবীর করণ্ কহে কর্ণে শুনে, ভনক্‌পরে নহি কাণ।
য়্যাসে শন্ত্ ন হ সুতিসে, পাওহি ব্রহ্ম গিনান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কানের দ্বারায় বলে ও কানের দ্বারায় শোনে। ভন্ ভন্ শব্দেতে কোনো কাজ হবে না। ওঁকারধ্বনি শব্দ শুনে আনন্দে সন্তসকলেরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

॥ দেখা তত্ত্ব করা ॥

'কবীর হেরত হেরত হে সখি, হেরত গই হেরায়।
বুঁন্দ সমানা সিন্ধুমে, সো কিত হেরা যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হে সখি! তোমায় খুঁজতে খুঁজতে খোঁজাই হারালুম। বিন্দু যা দেখছিলুম তাও আর দেখতে পাচ্ছি না। সমুদ্রের মতো অনন্ত ব্রহ্মে মিশে যাওয়ায় আর কোথায় খুঁজে পাবো?

'কবীর হেরত হেরত হে সখি, রাহা কবীরা হেরায়।
সিন্ধু সমানা বুন্দমে, সো কিত হেরা যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হে সখি, তোমায় খুঁজতে খুঁজতে কবীর সাহেব নিজেই হারিয়ে গেলেন। বিন্দুও সমুদ্রে প্রবেশ করায় তাকেও আর দেখা গেলো না।

'কবীর বুঁন্দ সমানা সিঁন্ধুমে, সো জানে সভ লোয়।
সিন্ধু সমানা বুঁন্দমে, বুঝে বিরলা কোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বিন্দু সমুদ্রের মতো, এ জানে সকলে। কিন্তু সিন্ধু যে প্রবেশ করে বিন্দুর মধ্যে এ অতি অল্প লোক জানে অর্থাৎ যাঁরা জানেন সেরূপ লোক অতিশয় বিরল।

'কবীর সমুদ্র সমানা বঁন্দুমে, গৌ খুর কে অস্থান।
ইচ্ছারূপ সমাইয়া, বহুরি না পাওয়ে জান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সমুদ্র বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করার জন্যে সে জায়গা গরুর খুরের মতো দেখা যেতে লাগলো। গরুর খুরের মতো যে জায়গা সেখানে ইচ্ছারূপী মন তার মধ্যে প্রবেশ করার জন্যে পুনরায় আর কিছু জানতে পারলো না।

'কবীর এক সমানা সকল মে, সকল সমানা তাহি।
কবীর সমানা বুঝি মে, জাহা দোসরো নহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, একের সমান এই সকলের মধ্যে আর সকলের সমানও সেই এক। কবীর সাহেব সেই সমান বুঝতে গিয়ে দেখলেন, সেখানে আর দুই নেই, সবই এক।

'কবীর গুরু নহি চেলা নহি, নহি মুরিদ নহি পীর।
এক নহি তুজা নহি, তাঁহা বিলমে দাস কবীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সেখানে গুরু নেই শিষ্যও নেই। নেই কোন মুরিদ (পীরের চেলা), পীরও নেই। যেখানে এক নেই সেখানে দুই আসবে কোথা থেকে। এমনি জায়গায় বিশ্রাম করে কবীর দাস।

'কবীর বির্ছয়ো ঢুঁড়ে বীজকোঁ, বীজ বির্ছকে পাহিঁ।
নিওজো ঢুঁড়ে ব্রহ্মকো, ব্রহ্মজিওকে মাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বৃক্ষ বীজকে খুঁজছে কিন্তু বীজ বৃক্ষেতেই রয়েছে অথচ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমনি সকলে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ব্রহ্মকে। কিন্তু ব্রহ্ম যিনি তিনি রয়েছেন জীবের মধ্যে।

'কবীর আদি হতা সো অব হায়, ফের ফার কছু নাহি।
যেঁ ও তরিওরকে বীজমে, ডার পাত কল ছাঁহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আদিতে যা ছিল এখনো তা আছে। এর আর ফেরফার কিছু নেই। যেমন তরুবরের বীজের মধ্যে ডাল-পাতা-ফল-ছায়া সবই রয়েছে কিছুই যায়নি তেমনি।

॥ জল্পনার বিষয় ॥

'ভারি কহে তো বহু ডরেঁ, হালুকা কহো তো ঝুট।
মে নেহি জানো রামকো, দিষ্ট দেখা নহি মুট।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যদি ভারি বলো তাহলে বড় ভয় আর যদি হাল্‌কা বলো তাহলে মিথ্যে। আমি রামকে জানি না, কারণ যদি রাম হাতের মুঠোর মধ্যে থাকতো তাহলে দেখতে পেতুম।

'কবীর দিঠা হায় তো ক্যা কহো, কহোঁ ত কো পতি আয়।
হরি জ্যাছে ত্যাছে রাহা, তুম হর্‌খি হর্‌খি গুণ গায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যদি দেখেছি বলি তাহলে কেই বা বিশ্বাস করবে। কথার দ্বারায় প্রকাশও করতে পারি না। হরি যিনি তিনি যেমন তেমনিই রয়েছেন। তুমি হরির গুণ গান করো।

'কবীর য়্যাছি কথনি মতি করো, কথোনে ধরো ছপায় ।
বেদ কিতেবোঁ না লিখো, কহোঁত কো পতি য়ায় ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এমন কথা কখনো বলো না, ওরকম কথা গোপন করবে। বেদ ও পুস্তকাদি লিখোও না। কেননা তোমার কথা বিশ্বাস করবে কে ?

'কবীর কর্তা কি গতি আওর হায়, তু চল অপনে অনুমান।
ধীরে ধীরে পাও ধরু, পঁহুচে গা নিজ ঠাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কর্তার গতি অন্যরকম। তুমি নিজের অনুমানে চলো। আস্তে আস্তে নিজের পা ধরো। তাহলেই পৌঁছবে নিজের জায়গায়।

'কবীর পঁহুচোগে তব কহহুগে, অব কছু কাহান যায়।
অজহু ভেলা সমুদ্রমে, বোলি বিগারে কায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যখন সেখানে পৌঁছবে তখন বলবে যে, এখন আর কিছু বলবার নেই আর বলাও যায় না। এখনো ভেলা রয়েছে সমুদ্রের মাঝে। আগে পারে যাও তারপর কথা বলো। নতুবা কথা বলার বাধা জন্মাতে পারে অর্থাৎ কথা ঠিক না হতে পারে।

'কবীর জানি বুঝি জড় হোয় রহে, বল তেজি নির্ব্বল হোয়।
কহেঁ কবীর তেহা দাসকো, পল্লা ন পকরে কোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি জেনে বুঝেছেন তিনি জড়োসড়ো হয়ে রয়েছেন অর্থাৎ স্থিরভাবে রয়েছেন। বল ও তেজ হয়েছে নির্বলের মতন। কবীর বলছেন, তাঁর পাল্লা কেউ ধরতে পারে না অর্থাৎ তাঁর কাছে যাওয়া যায় না।

'কবীর বাদ বিবাদ বিখয় ঘনা, বোলে বহুত উপাধি।
মৌন রূপ গহি হরি ভজে, যো কোই জানে সাধি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বেশি কথাবার্তায় বিষয়বুদ্ধি বাড়তে পারে আর অনেক উপাধির কথাই বলে। আর যিনি সাধন করেন, মৌনভাবে হরির ভজন করেন, তিনিই জেনেছেন।

'কবীর সাক্ষি এক কবীর কি, শুনি শিখি নহি যায়।
রঞ্চক ঘটমে সঞ্চরে, তৌ অজর অমর হোয় জায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কবীরের একটি সাক্ষি শুনেই শিক্ষা হয় না। যখন এই শরীরের মধ্যে তা সঞ্চার হবে তখন অজর অমর হবে নচেৎ কিছুই হয় না।

॥ লোকের বিষয় ॥

'কবীর সুরতি টেকুরি লৌ লেজুরি, মন নিতি ডার নিহার।
কৌল কু আমি প্রেম রস, পীওয়ে বারম্বার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্থির মনে টেকোর সুতো বের করো আর সর্বদা তাতে মন ফেলে রাখো। কমলের মধ্যে যে কুয়ো আছে তাতে প্রেমরসও আছে। তাহলেই বারংবার পান করতে পাবে।

'কবীর গঙ্গ যমুন কে অন্তরে, সহজ শূন্য হায় ঘাট।
তাঁহা কবীরা মট রচৌ, মুনি জন জোওয়ে বাট।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে সহজরূপ শূন্য মাঠ আছে। কবীর সাহেব সেখানে একটি মন্দির তৈরী করেছেন। যাঁরা নিজের মধ্যে নিজে থেকে মৌনি হয়েছেন তাঁদেরকে মুনি বলে। তাঁরা সেখানে যেতে ইচ্ছে করেন।

'কবীর জেহি বনসি ঘন সঞ্চরৈ, রায়্ পন্‌ছি না উড়ি আয়।
মোটা ভাগ্ কবীর কা, তাঁহা রাহা লৌ লায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যখন বাঁশীতে ঘনরূপে সঞ্চার হতে লাগলো অর্থাৎ বাঁশী বাজতে লাগলো তখন আর রাইস্বরূপ পাখি উড়ে যায় না। কবীরের মোটা ভাগে লয় লাগিয়ে রয়েছেন অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাগে না গিয়ে স্থূল ভাগে লয় লাগিয়েছেন।

'কবীর লও লাগি তব জানিয়ে, কবহি ছুড়ি ন যায়।
জীয়ৎ তো লাগি রহে, মুয়ে মাহি সমায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, লয় লেগেছে তখনি জানবে যখন আর কিছুতেই ছাড়া যায় না। জীবিতাবস্থায় তো লেগেই থাকে। দেহত্যাগ করলেও লয় হয়ে যান। লয় কিছুতে ছাড়ে না।

'কবীর য্যাছি লাগি য়ো রসো, ত্যাছি নিম হায় ছোড়।
কোটী কোটী জোরিকে, কিয়া লাখ করোর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যেমন যেমন ভাবে রস পাচ্ছে সেই সেই ভাবে নিমরূপী তিক্ত মায়া ছাড়ছে। এরূপ লক্ষবার, কোটি কোটি বার একসঙ্গে জড় করলে তবে অনেক স্থায়ী হয়।

'কবীর জ্যায়ছি উপজে পেড় সোঁ, ত্যাছি নিম হায় জোর।
আপনে তন কি ক্যা কহৈ, তারে পরিবার করোর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এমন বৃক্ষ যেমন বাড়ছে নিমেরও তেমনি বল বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজের শরীরের বিষয় আর কি বলবেন, কতো কোটি পরিবারকে উদ্ধার করছেন অর্থাৎ রক্ষা করছেন।

'কবীর জ্যাছি প্রথমে লৌ লগৈ, ত্যায়ছি ধুরলে যায়।
জাকে হির্দয়ে লৌ বসৈ, সো মোহি মাহি সমায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রথমে যেমন লয়ের আগ্রহ হবে সেই আগ্রহে যতোদুর যেতো পারো ততো দুর যাওয়া চাই। যার হৃদয়ে লয়রূপ আগ্রহ বসে, সে আমিই আর আমাতে মিশেছে।

'কবীর জর লগি কথনি হম কথো, চুরি রাহা জগদীশ।
লৌ লাগি পল না পরে, অল বোল না নহি দীশ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে পর্যন্ত আমি কথা বলছি ততক্ষণ পর্যন্ত জগদীশ দূরে রয়েছেন। আর যখন লয় লাগলো তখন এক পল ছাড়া নই। এখন আর কোনো কথা বলবার ইচ্ছে করে না আর কথা বলতেও কষ্ট হয়।

'কবীর সদ্গুরু ততু লখাইয়া, গ্রন্থ হি মাহি মূল।
লৌ লাগি নিরমল ভরা, মেটি গয়া সংশয় শূল।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সৎগুরু যিনি তিনি তো দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু মূল গ্রন্থিতেই রয়েছে। কেবল লয়ের জন্যে নির্মল হয়েছে আর সংশয়রূপ শূলও গেছে মিটে।

॥ পতিব্রতার বিষয় ॥

'কবীর প্রিত লাগি মেরি তুঝতে, বহু গুণিয়া লয় কন্ত।
যও হাঁসি বোলি আওর তে, তো নিতহি রঙ্গায়ো দন্ত।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তোমাতে আমার প্রীতি জন্মেছে। কারণ তুমি অনেক গুণযুক্ত কান্ত। যখন অপরের সঙ্গে হাসতুম ও কথা বলতুম তখন ভালো দেখাবার জন্যে প্রত্যহ দাঁত রাঙাতুম।

'কবীর চৈততি রহোঁ ন বিসরেঁা, তু পদ দরশি থায়।
এহ অঙ্গ বঁদরো ভলা, যব তুঝ সোঁ মিলিয়া আয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সর্বদা চিন্তা করো, ভুলো না অর্থাৎ সর্বদা মনে রেখো যেন তোমার পাদপদ্মেতে মন থাকে। যদি তোমাতে মিলে থাকতে পারি তাহলে এই শরীর বাঁদরের মতন হলেও ক্ষতি নেই। নতুবা সবই বৃথা।

'কবীর নয়না ভিতর আউতু, তেঁহ নয়ন ঝপেহু।
নাহি দেখ আওর কোঁ, নাতু দেখ ন দেহু।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তুমি নয়নের ভেতর এসো। তুমি যখন এসো তখন নয়ন বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর কাউকেও দেখা যায় না, তুমিও আর কাউকে দেখতে দাও না।

'কবীর রেখা এক সিন্দুর কি, কজরা দিয় ন যায়।
নয়নন্ রাম রাচার হায়, দুজা কাঁহা সমায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সিন্দূরের একটি রেখা রয়েছে কিন্তু কাজল দেওয়া যায় না। আর নয়নেতে রাম তো রচনা হয়ে রয়েছেন, তখন আর দ্বিতীয় কী প্রকারে আসবে ?

'কবীর আট পহর চৌষট্ ঘড়ি, মেরে আওরান কোই।
নয়ননূহ মে তুম্ হি বসো, নিদ ন আওয়ে সোই।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, অষ্ট প্রহর ও চৌষট্টি ঘড়ি আমি একা রয়েছি। আমার আর কেউ নেই। আমার নয়নের ওপর তুমি এসে বসে রয়েছো। এই কারণে ঘুম আসছে না।

'কবীর নিদ দেখ যব পুর্ষকো, উলটী আপু উঠি যাৎ।
তাতে নিকট আওয়ে নেহি, মূঢ়ন তে ন ডেরাৎ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পুরুষ যখন নিদ্রা যাচ্ছেন তখন আপনি উলটে উঠে যায় আর কাছে আসে না এবং মূঢ়ের মতো ভয়ও আর নেই।

'কবীর সাঁই মেরে এক তু, দুজা আওর ন কোয়।
দুজা সাঁই তব কহো, যব কলি দুজা হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সাঁই যিনি তিনি আমার একমাত্র কর্তা। দ্বিতীয় আর কেউ নেই। দ্বিতীয় কর্তা তখন বোলো যখন দ্বিতীয় কলি হবে।

'কবীর বারবার কেয়া আঁখিয়া, মেরে মন কি শোয়।
কলিতো উথলি হোয়গি, সাঁই আওর ন কোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বারংবার নয়ন দিয়ে অন্য বস্তু আর কী দেখবো! আমার মন যিনি তিনি তো শুয়ে রয়েছেন। কিন্তু যখন কলি উদয় হবে তখন কর্তাকে দেখা চাই। কারণ কর্তা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

'কবীর বলিহারি ওয়া দুঃখ কি, যো পল পল রাম কাহায়।
ওয়া সুখকে মাথে শিলা, যো হরি হির্দয়া সো যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ওরকম দুঃখের বলিহারি যাই যাতে প্রতি পলে পলে রাম নাম কহা যায়। যার হৃদয় হতে হরিনাম যায় সে যদি সুখে থাকে সেও ভালো নয়। ওরকম সুখের মাথায় শিলাপাথর চাপাও।

'কবীর রহে সমুদ্রকে বীচমো, রটে পিয়াস পিয়াস।
সকল সমুদ্র তিণুকা গণে, এক স্বাতি বুন্দ কি আশ।'

অর্থাৎ, সমুদ্রের মাঝে আছি অথচ পিপাসায় মরলুম এরূপ বলে বেড়াচ্ছি। একমাত্র স্বাতি বিন্দুর আশায় সকল সমুদ্রকে তৃণের ন্যায় মনে করে।

'কবীর সুখ কারণ কো যাত থে, আগে মিলিয়া দুঃখ।
যাহু সুখ ঘর আপনে, হামরে দুঃখ সম্মুখ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, সুখের জন্যে যাচ্ছিলুম কিন্তু দুঃখ আগেই মিলে গেলো। সুখের ঘর আপনেতেই আছে কিন্তু আমার সামনে দুঃখ।

'কবীর দোজক কো হাম অঙ্গয়া, সো ডরা নাহি মুঝ।
বিহিস্তি ন মেরো চাহিয়ে, বাঁঝু পিয়ারে তুঝ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমি নরক অঙ্গেতে ঢাকা দিয়েই রয়েছি। তাতে আমার ভয় নেই। কোনো সুখ-দুঃখ কিছুই চাই না। তোমাকেই চাই। হে প্রিয়! আমি বাঁঝা হয়ে থাকি সেও আমার ভালো, আমি সন্তানাদি কিছুই চাই না, তোমাকেই চাই। আর কিছুই প্রয়োজন নেই।

'কবীর যো ওহি এক ন জানিয়া, তো সব হি জান অজান।
যো ওহি এক হি জানিয়া, তো সবে অজান সুজান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি এককে জানেন না তাঁর যাকিছু জানা আছে সব অজানার মধ্যে। কেননা, একের অভাবে কিছুই নেই। আর যিনি সেই এককে জেনেছেন তাঁর পক্ষে সবই জানা হয়েছে। অজানিত কিছুই নেই। কারণ এক ছাড়া আর কিছুই নেই যখন, তখন সেই এককে জানলে সব জানা হলো। আর সেই এককে না জানতে পারলে কিছুই জানা হয় নি।

'কবীর যো ওহ এক ন জানিয়া, তও সব জানে ক্যা হোয়!
এক হিঁতে সব হোঁত হায়, সব তে এক ন হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যখন সেই এককে জানতে পারলে না তখন তোমার সব জানাতে কী হলো! সমস্ত এক না হলেও 'এক হতে

হচ্ছে সমস্ত। অর্থাৎ জাগতিক সংসারে যাকিছু দৃশ্যমান বস্তু সবই সেই এক হতে হচ্ছে। সেই এককে জানা চাই। নচেৎ সব বৃথা জানা। আর সাধন ছাড়া কিছু হয় না। সাধনার দ্বারা আর সৎগুরুর কৃপায় তা জানা যেতে পারে।

'কবীর এক সাধে সব সাধিয়া, সব সাধে সব যায়।
উলটাকে সিঁচে মূল কোঁ, তও ফুলে ফলে অঘায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, একের সাধন করলে সকলের সাধন করা হলো। যেমন একটি মূলকে উল্টে সিঞ্চন করলে ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হয় আর সকলের সাধন করতে গেলে কারও সাধন করা হয় না।

'কবীর সব আয়া উস এক সেঁা, ডার পাত ফল্ ফুল্।
কবীর পাছেঁ ক্যা রাহা, যব পকরা নিজ মূল্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এক থেকেই সব হয়েছে—ডাল, পাতা, ফল, ফুল, যাকিছু দেখছো। কবীর বলছেন, যখন নিজের মূল ধরলুম তখন আর কী থাকলো!

'কবীর মূল কবীরা গহি চড়ে, ফল্ খায়া ভরি পেট।
চোর সাহুকি গমি নহিঁ, যেঁও ভাওয়ে তেও লেট।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মূল ধরে গাছে চড়ে পেট ভরে ফল খেলেন। সেখানে কেবল চোর আর সাহু (ধনী) যেতে পারে না। ধনী ব্যক্তিও যেতে পারে না, যা ভাবে তাই করে, শোবার ইচ্ছে হলো তো অমনি শুয়ে পড়লো।

'কবীর যও মন লাগয়ে এক সেঁা, তও নিরুয়ারি যায়।
সাদর দোয় মুখ বাজতি, ঘন তমা বাখায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যখন মন একেতে লেগেছে তখনি রাস্তা পেলো আর সাদর সম্ভাষণও কেবল মুখের কথামাত্র, বাড়াবাড়ি হলেই আঘাত পায়।

'কবীর আশাতো এক নাম কি, চুজি আশ নিরাশ।
পানি মাহি ঘর কিয়া, সোকো মরে পিয়াস।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আশা যা করা যায় তাতো এক নামেরই। আর দ্বিতীয় আশা ইচ্ছারহিত হবার জন্যে। জলের মধ্যেই করেছি ঘর কিন্তু আশারূপ পিপাসায় মরছি।

'কবীর কলিযুগ আইকে, কিয়া বহুৎ সো মিৎ।
যিন্‌হ দিল্‌ বান্ধা এক সেঁ, তিন্‌হ সুখ পারা নিৎ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কলিযুগ এসে অনেক মিত্রতা করেছে। কিন্তু যাঁর মন একেতে বাঁধা আছে তাঁর আর কী করবে! তার নিত্যই সুখ।

'কবীর পতিবরতা কোঁ সুখ ঘনা, যাকে বরৎ হায় এক।
মন ময়লি বিভ্‌চারিণী, তাকে খসম্‌ অনেক।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পতিব্রতার ভারী সুখ কারণ তার ব্রত এক। আর যার মন ময়লায় পূর্ণ সে ব্যাভিচারিণী। তার পতি একাধিক।

'কবীর পতিবর তাকোঁ এক হায়, বিভ্‌চারিণী কোঁ দোয়।
পতিবরৎ বিভ্‌চারিণী, কহু কো ভলা হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পতিব্রতা যিনি তিনি এক আর ব্যভিচারিণী যিনি তিনি দুই। এখন পতিব্রতা ও ব্যভিচারিণীর মধ্যে কোনটি ভালো তা বলো।

'কবীর পতিবরতা ময়লি ভলি, কালি কুচিলি কুরূপ।
ওয়াকে ময়লে রূপ পর, ওয়ারো কোট স্বরূপ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পতিব্রতা যিনি তিনি দেখতে ময়লা হলেও ভালো। ওর ময়লা রূপের কাছে কোটি কোটি সুন্দর রূপ কাটে।

'কবীর পতিবরতা তব জানিয়ে, রতি ন খন্তে নয়ন।
অন্তর সেঁ সাঁচ রহে, বোলে মিঠি বয়ন।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পতিব্রতা তখন জানবে যখন পতি হতে মন এক রতিমাত্র, অন্যত্রে যায় না। তখনি পতিব্রতা ঠিক হয়েছে। অন্তরে খাঁটি থেকে মুখে বলেন মিষ্টি কথা।

'কবীর বালে ভোলে খসম্ কি, বহুৎ কিয়া বিভচার।
সদ্‌গুরু রহে বতাইয়া, পরম পুরুখ্ ভরতার।'

অর্থাৎ, কবীব বলছেন, বাল্যকালে ভ্রমবশতঃ অনেক ব্যভিচার করেছি। কিন্তু যখন সৎগুরু রাস্তা বলে দিলেন তখন পরম পুরুষকে ভাতার বা স্বামী বলে জানলুম।

'কবীর ভেদ যো লেওয়ে বৈঠিক্যো, সব সোঁ কহে পুকারি।
ধরাধরে সো ধরকুটী, অধর ধরে সো নারী।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি উক্ত বিষয়ের ভেদ করেছেন তিনি সকলকে চীৎকার করে বলেছেন, যিনি পৃথ্বীতত্ত্ব হতে শূন্যতত্ত্ব পর্যন্ত ধরতে পেরেছেন তিনি একটি কুটীস্বরূপ জায়গা পেয়েছেন, আর যিনি খালি অধর (ন ধর) ধরেছেন তিনিই স্ত্রীলোক।

'কবীর মায় সেওয়ক সামরথ কো, কোই পূরবকা ভাগ।
শোয়ৎ জাগি সুন্দরী, সাঁই দিয়া সোহাগ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমি সমান রূপের সেবক। তাও পূর্বজন্মের ভাগ্য অনুসারে ঘটেছে। সুন্দরী যিনি তিনি নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তিনি জেগে উঠলেন। সাঁই (কর্তা) তাঁকে আদর করে দিলেন সোহাগ।

কবীর ময় সেওয়ক্ সামরথ্‌কা, কব্‌হি নহো অকাজ।
পতিবরতা নঙ্গী রহে, তও ওহি পিয়াকোঁ লাজ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমি সমানরূপ অবস্থার সেবক। কখনো কোনো অকাজ করি না। পতিব্রতা যিনি তিনি পতির কাছে উলঙ্গই থাকেন বরং স্বামিরই লজ্জা হয়।

'কবীর তু তু কহে তো দুরি হোঁ, দুরি কহে তো আঁও।
যোঁ হি রাখে ত্যো রহোঁ, য্যো দেওয়া সো খাঁও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যদি তুমি তুমি করো তাহলে তিনি দূরে থাকেন। আর দূরে যদি বলো তাহলে কাছে। যেমন অবস্থায় তিনি রাখেন তেমনি অবস্থায় থাকো। যা তিনি দেন তাই খাও।

'কবীর যো গাওয়ে সো গাওনিয়া, যো জোড়ে সো জোড়।
পতিবর্তা আও সাধুজন্, এহ কলি মহঁ হায় থোর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে গান করে তাকে বলে গায়ক। যেমন জুড়তে পার তেমনি যোড় অর্থাৎ যতদূর পার ততদূর চেষ্টা করো কারণ সকলেই পতিব্রতা ও সাধু নয়। চেষ্টা করলেই হবে। কলিতে সাধু ও পতিব্রতার সংখ্যা কম।

'কবীর পরমেস্বর আয়ে পাহুনা, শূন্য সনে হি দাস।
খট্‌রস ভোজন ভক্তি করু, যো কব্ হি ন ছোড়ে পাশ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পরমেশ্বর এসেছেন, তাঁকে ছ'রস ভোজন করাও। আর খুব ভক্তি করো আর তার সঙ্গ ত্যাগ করো না। কবীরদাস শূন্যের সঙ্গেই রয়েছেন।

'কবীর উচি যাতি পপিহরা, নওয়ে ন নীচা নীর।
কি স্বরপতি কো যাচই, কি দুঃখ পহে শরীর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, চাতক উর্ধ্বমুখে আকাশের বারিই পান করে থাকে। নীচে অনেক জল আছে কিন্তু তা পান করে না। সুরপতি ইন্দ্রের কাছে মেঘের জল প্রার্থনা করে থাকে। যতকাল না মেঘের জল পায় ততকাল কতো দুঃখ সহ্য করে মেঘের জলের আশায় বসে থাকে, তাতে শরীর নষ্ট হয়ে যায় সেও স্বীকার।

'কবীর ময় অবলা পিউ পিউ করোঁ, নিরগুণ্ মেরা পিউ।
শূন্য সনেহি রাম বিনু, আওর ন দেখো পিউ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমি তো অবলা স্ত্রী। কেবল 'হে স্বামি! হে স্বামি!' করছি। আমার যিনি স্বামী তিনি তো নির্গুণ। শূন্যের সঙ্গে আত্মারাম ছাড়া আর তো কোনো শিব দেখছি না অর্থাৎ আত্মারামই একমাত্র শিব। তিনি মঙ্গলময়। তাছাড়া আর কোনো শিব নেই।

'কবীর পতিবর্তা ব্রত কুম্ভজল, পতি ভজি ধরে বিশ্বাস।
আন্‌দিশা চিতওয়ে নহি, সদা যো পিউকি আশ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পতিব্রতা কিরূপ যেমন পূর্ণ কুম্ভের জল অর্থাৎ পূর্ণ কুম্ভের জল যেমন স্থির থাকে তেমনি পতিব্রতার ব্রতও ঠিক থাকে, কোনো দিকে টলে না। সর্বদা স্বামীর আশায় বসে থাকেন, অন্য কোনো দিকে নজর করেন না।

'কবীর পতিবর্তা ক্যায়ছে রহে, য্যায়ছে চোলি পান।
তব্ সুখ দেখই পিওকা, যব চিৎ নহি আওয়ে আন।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পতিব্রতা এমনভাবে থাকেন যেমন চোলি আর পান। চোলি অর্থাৎ কাঁচুলি যেমন কষে বাধলে বক্ষস্থলে টান থাকে ও পান খেলে যেমন মনের একটু তৃপ্তি হয় তেমনি পতিব্রতার হয়ে থাকে। চিত্ত অন্যদিকে না গিয়ে স্বামীর ওপর টান থাকে আর তখন স্বামী যে কী তা বুঝতে পারে।

॥ চৈতন্য করবার বিষয় ॥

'কবীর নৌবৎ আপনি, দিন দশ লেহু বজায়।
এহ পুর পাট ন এহ গলি, বহুরি ন দেখহু আয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, নওবৎ যা বাজছে তা দিন দশ বাজিয়ে নিন। এ পূর্ণ নয়। এ রাস্তায় একবার গেলে পুনরায় আর কিছু দেখাও যায় না, শোনাও যায় না।

'কবীর যেহি ঘর নওবৎ বাজতি, মায় গল্ বাঁধে দোয়ার।
একৈ হরিকে নাম বিনু, গয়ে বজাওনি হার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে ঘরে নওবৎ বাজছে তা শোনার জন্যে গলা ও দরজা বেঁধে রেখেছি অর্থাৎ ঠিক করে শব্দ শুনছি। তাতেই বা কী হবে? এক নাম ছাড়া গতি নেই।

'কবীর যিন্হ ঘর নওবৎ বাজতি, হোত ছতিশো রাগ।
তে মন্দিল্ খালি পড়ে, বৈঠন্ লাগে কাগ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে ঘরে ছত্রিশ রাগিনীর সঙ্গে নওবৎ বাজছে সে ঘর খালি হয়ে যায় আর তার ওপর এসে বসে কাক।

'কবীর ঢোল দামামা দুন্দুভি, সহনাই আরু ভেরী।
অও সর চলে বজাইকে, হায় কোই ল্যাওয়ে ফেরি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ঢোল, দামামা, দুন্দুভি, সানাই আর ভেরী আরও অনেক রকম শব্দ যা শোনা যায় তা বাজিয়ে চলেছে। কিন্তু এমন কেউ আছে যা একবার হয়ে গেলে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে।

'কবীর থোরা জীও না, মাড়ে বহুৎ মণ্ডান।
সব হি উভা মেল সি, কেয়া রঙ্ক্ কেয়া সুলতান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জীবন অতি অল্পই আর অনেক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটি ফকীর ও বাদ্‌শা উভয়ের মধ্যেই আছে।

'কবীর একদিন য়্যায়ছা হোয়েগা, সভতে পরে বিছো।
রাজা রাণা ছত্রপতি, সাবধান কোঁ নহি সো।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, একদিন এমন হবে যে সকলের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে। কি রাজা, কি রাণা, কি ছত্রপতি সকলেরই আছে কিন্তু যিনি সাবধান তাঁর নেই।

'কবীর উজ্জর্ খেড়া ঠীকরি, গড়ি গড়ি গয়ে কুঁ ভার।
রাওয়ণ সরিখা চলি গয়া, লঙ্কাকে সরদার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি কুমার তিনি অনেক উজ্জ্বল রঙ্গের খপেরা তৈরী করেছেন। লঙ্কার সর্দার রাবণের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অনেক উজ্জ্বল খাপ্‌রা চলে গেছে। কিন্তু কুমাররূপী আত্মা তিনি যেমন তেমনি রয়েছেন।

'কবীর উচা মহাল বনাইয়া, চূণে কলি ঢেরায়ে।
একে হরিকে নাম বিনু, যব তব পরে ভুলায়ে।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, একটি উঁচু মহল তৈরী করে তাতে চুনকাম করে কলি ধরালুম। কিন্তু হরিনাম ছাড়া যখন-তখন ঐ অবস্থা ভুলে ভুলে যায়।

'কবীর কাঁহা গর্বিয়ো, চাম লপেটা হাড়।
হায়ওর উপর ছত্রপতি, তেভি দেখা খাড়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কোথায় তোমার গর্ব। কেবল হাড় আর চামড়া দিয়ে শরীর রয়েছে ঢাকা। ওপরে যিনি ছত্রপতি রয়েছেন তিনি খাড়া হয়ে দেখছেন।

'কবীর কাঁহাঁ গর্বিয়ো, উচা দেখি আওয়াস।'
কল্‌হি পড়েই ভূঁই লোটনা, উপর জামে ঘাস।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তোমাব গর্ব কোথায় আর আবাস দেখছি উঁচুতে। কিন্তু কালই মাটিতে লোটাতে হবে। এমন ভূমিতে লোটাতে হবে যার ওপরে ঘাস জন্মায়।

'কবীর কাঁহাঁ গর্বিয়ো, কাল গঁহে শির কেশ।
না জানি কাঁহাঁ মারি হায়, কি ঘর কি পরদেশ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তোমার গর্ব কোথায়? কাল তোমার মাথার চুল ধরে রেখেছেন। ঘরেই মারবেন কিংবা বিদেশে মারবেন, কোথায় মারবেন তার কিছুই ঠিকানা নেই।

'কবীর উত্তিম্ ক্ষেতি দেখিকে, গটে কাঁহাঁ কিষাণ।
অজহু ঝোলা বহুৎ হায়, ঘর আওয়ে তব জান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, উত্তম ক্ষেত্র দেখে কৃষাণ কোথায় অহঙ্কার করে থাকে। এখন ঝোলা বা ফসল (বাকি ক্রিয়া) অনেক আছে। যখন তা ঘরে আসবে (স্থির হয় বা প্রাপ্তি হয়) তখন জানবে সে ক্ষেত্র ভালো।

'কবীর যেহি ঘর প্রীতি ন প্রেম রস, আও রসনা নহিঁ নাম।
তে নর আয়ে সংসার মে, উপজে ক্ষপে বেকাম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে ঘরে সন্তোষ ও প্রেমরস নেই আর রসনাতেও নাম নেই এরূপ মানুষ বিনা কাজে সংসারে যাতায়াত করছে।

'কবীর য্যাছা এহ সংসার হায়, য্যায়ছা মালতী ফুল।
দিন দশ্‌কে বেওহার মে, ঝুঁটে রঙ্গন্ ভুল।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এ সংসার যেন মালতী ফুল। মালতী ফুল

যেমন কতকটা সময়ের জন্যে মানুষকে গন্ধ ও রূপের দ্বারায় মোহিত করে। কিছুক্ষণ পরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তেমনি এই সংসারও দশ দিনের জন্যে মিথ্যে রঙ চঙে ভোলায়।

'কবীর ধূরি সকেলিকে, পোট বাঁন্ধি এহ দেহ।
দেওয়স্ চারিকা পেক্‌না, অন্ত্ খেহ কি খেহ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই শরীর ধূলোর পুঁটলির মতো চারদিনের জন্যে প্রেরিত হয়ে এসে বাহার দিচ্ছে। শেষ সময়ে যে ধূলো সেই ধূলোই।

'কবীর চারি পহর ধন্ধে গয়া, তিনি পহর রহু শোয়।
এক পহর বন্দ্রেগি করো, যো জন্ম সওয়ারথ্ হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, চার প্রহর কেটে গেলো নানা কাজে। আর তিন প্রহর গেলো শুয়ে। বাকি যে এক প্রহর সেই এক প্রহর বৃথা নষ্ট না করে ভগবানকে ডাকো অর্থাৎ সাধন করো। তাহলে জন্ম হবে সার্থক।

'কবীর রাতি গোয়াই শোই করি, দেওয়স্ গৌয়াই খাই।
হীরা জন্ম অমোল্ হায়, কৌড়ি বদলে যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাতটা শুয়েই কাটিয়েছি আর দিনটা কাটিয়েছি খেয়ে। হায়! এমন হীরের মত অমূল্য জন্ম যাচ্ছে কড়ির বিনিময়ে।

'কবীর মন্দিল্ খাক্‌কা, জড়িয়া হীরা লাল।
দেওয়স্ চারিক্ পেখ্ না, বিনশি যায়গা কাল।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই দেহরূপ মন্দির পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। হীরা, চুনীর অলঙ্কার সকল পরে বৃথা অহংকার করছো। দিন চারেকের জন্যে প্রেরিত হয়ে বৃথা বাহার দিচ্ছো। একদিন কালের দ্বারায় বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

'কবীর স্বপ্নারৈয়ন্ কা, উঘরি গয়া যব নয়ন।
জীক পড়া বহু লুট্‌মে, না কছু লেন ন দেন।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, স্বপ্নাবস্থার পর নয়ন গেলো ঘুরে। জীব তখন বড় ভাবনায় পড়লেন। অথচ না-কিছু নেওয়া আছে, না-কিছু দেওয়া আছে—কিছুই হলো না।

'কবীর ই হায় চিতাওনী, যৌ নিরুয়ারী যায়।
যো পহিলে' সুখ ভোগিয়ে, সো পাছে দুখ্ খায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এরূপ অহংকার ত্যাগ না করে নিজের চেতনা না হতে হতে যিনি সুখ ভোগ করেন পরে তিনি দুঃখ পেয়ে থাকেন।

'কবীর আজুকি কাল্ ন্হমে, জঙ্গল হোয়েগা বাস।
উপর উপরা কি রহেঙ্গে, ঠোর চরণ্তা ঘাস।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আজ হোক বা কাল হোক তোমার বাসস্থান জঙ্গল হয়ে যাবে। ওপরে ওপরে ফিরে বেড়াবে। ঘুরতে ঘুরতে ঠিকানা না পেয়ে শেষে ঘাস খাবে।

'কবীর মুঁয়ে হো মরি যাহুগে, কই ন লেগা নাও।
উজর যাই বসাই হো, ছোড়ি সন্তা গাঁও।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যদি মরে থাকো তাহলে মরে যাবে। কেউ তোমার নামও নেবে না। উজড় হয়ে গেলে আবার একটায় বসাবে সাধুদের গ্রাম বাদ দিয়ে।

'কবীর হাড় জ্বরে যেঁ ও লক্ড়ি, কেশ জ্বরে যেঁ ও ঘাস।
সব জগ জ্বরতা দেখি কে, ভয়া কবীর উদাস।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যেমন কাঠ জ্বলে তেমনি হাড় জ্বলছে। ঘাস যেমন জ্বলে তেমনি চুল জ্বলছে। সকল জগৎ জ্বলতে দেখে কবীর সাহেব উদাস হয়ে রইলেন।

'কবীর রাখ নিহারা বাহরা, চিড়ীয়ন্হ খায়া ক্ষেত।
আধা পর্ধা উবরে, চেতি শকে তো চেত।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, বাইরে নজর রাখার ফলে চিড়িয়ারা ক্ষেত খেয়ে ফেলছে। অর্ধেকের ওপর উঠে যদি চৈতন্য করতে পারো তাহলে করো।

'কবীর যো জন্মে সো ভি মরে, হম্‌ভি চল্ নেহার।
মেরে পিছে যো পরা, তিন্‌হ ভি বাঁধা ভার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি জন্মেছেন তিনি তো মরবেন কিন্তু আমি চলে যাবো। আমার পেছনে যিনি পড়বেন তিনিও ভার বাঁধবেন।

'কবীর মায় বুঢ়ানী বাপ্ বুঢ়ানা, হম্‌ভি মাঝ বুঢ়ায়।
কেওটিয়াকে নাও যেঁ ও, সংযোগে মিলে আয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মা ডুবেছেন, বাপও ডুবেছেন। আমিও তার মাঝখানে ডুবেছি। দৈবসংযোগে একখানি কৈবর্তের নৌকো পেয়ে বেঁচে গেলুম।

'কবীর দেওয়ল্ হাড়কা, মাসতে বাঁধা আন।
খড় খড় তা পায়া নহি, দেওয়ল্ কা সহি দান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, হাড়ের মন্দির বাঁধা আছে মাংসের দ্বারায়। এতে আছেন ভগবান। কিন্তু ওরূপ মন্দিরে তাঁকে খুঁজে পেলুম না। না পাবার কারণ সৎগুরুর উপদেশের অভাব। উপদেশ ছাড়া জানতে পারা যায় না।

'কবীর দেওয়ল্ ঢহি পরা, ইট্ ভয়ি সয়কোর।
চিতেরা চুনি চুনি গয়া, মিলা না হুজি দোর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মন্দির পড়ে যাওয়ায় ইট্‌গুলো এখানে ওখানে পড়ে গেছে। চৈতন্য তা খুঁটে খুঁটে খেয়েছেন। কিন্তু সেখানে যে যাবো তার দরজা খুঁজে পাচ্ছি না।

'কবীর রামনাম জানেও নহি, বেমুখ আন্‌হি আন।
কি ভুষা কি কাতরা, খাতে গয়া পরাণ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনাম জানলেও, তাতে বিমুখ হয়ে অন্য বস্তুতে রত হলে। প্রাণটা ভুয়ো জাব খেয়েই হারালে অর্থাৎ প্রাণটা বৃথা নষ্ট করলে, কিছুই করতে পারলে না।

'কবীর রাম পিয়ারে ছোড়িকে, করে আওর কো জাপ।
বিশ্যাকেরা পুত্র যো, কহে কোন কো বাপ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, প্রিয় রামকে ছেড়ে অন্য জপ করতে লাগলে! তাতে আর কী হবে! যেমন বেশ্যার ছেলে! বাপের ঠিক নেই কাকে বলবে বাপ?

'কবীর যিন্‌হ হরি কি চোরী করি, গয়ে নাম গুণ ভুলি।
তেহি বিধনে বাহুর বঁচো, রহে উর্দ্ধমুখ ঝুলি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যিনি হরিকে চুরি করে (ক্রিয়া না করে) হরিনাম গুণ ভুলে গেছেন, বিধাতা তাঁকে বাহুড় করে দিয়েছেন। তিনি সর্বদা উর্ধ্ব মুখে ঝুলে থাকেন অর্থাৎ আকাশের দিকে মুখ করে ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে 'হায়! হায়!' করছে।

'কবীর রামনাম জানিয়ো নহি, বাণি বিনাঠি মূল।
হরি ত্যজি ইহাই রহি গয়া, অন্ত পরিমূখ ধূল।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনাম জানলে না। কথার মূল কারণ বিনাঠি (অর্থাৎ একটি লাঠির হু'দিকে আগুন জ্বেলে মধ্যে ধরে যাকে ঘোরায় অর্থাৎ নীচে কামাদির অগ্নি আর ওপরে ব্রহ্মরন্ধ্রের অগ্নি—এই বিনাঠির অগ্নির দ্বারায় কথা হচ্ছে)। হরিকে ত্যাগ করে রইলে। অন্তে মরে গেলে মুখে পড়বে ধূলো।

'কবীর রাম নাম জানেও নহি, লাগি মোটি খোরি।
কায়া হাঁড়ি কাঠ কি, না ওহ চড়ে বহোরি।

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনাম তাতো জানলে না আর কাঠের হাঁড়ির মতো শরীর তাতেও চড়তে পারলে না।

'কবীর রামনাম জানেও নহি, চুকেয়ো অব কি ঘাত।
মাটি মিলন কুঁহার কি, ঘনি সহেগা লাত।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনাম তাও তো জানো না আর এমন সুবিধে তাও হারালে। কুমোর যেমন মাটি তৈরী হয়েছে কিনা পায়ের দ্বারা বুঝে নেয় তেমনি (তুমি রামনাম) ঠিক করে বুঝে নিতে পারলে না।

'কবীর এহ সংসারমে, ঘনা মনিখ্ মত হীন্।
রাম নাম জানেয়ো নহি, আয়ে বুঢ়াপা দিন্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই সংসারেতে অনেক মনুষ্য মত (শাস্ত্রোক্ত কর্ম) হীন হয়েছে। রামনাম তাও জানলে না। বৃদ্ধাবস্থা এসে গেলো।

'কবীর কহে কিয়া তুম আইকে, কহে করোগে যায়।
ইৎকে ভয়ে ন উওকে, চলে জন্ম্ জহড়ায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, তুমি এখানে এসে কী করলে আর সেখানে গিয়ে বা কী করবে। এ দিকেরও কিছু করলে না ওদিকেরও কিছু করলে না। জন্মটা বৃথা নষ্ট করলে।

'কবীর এক হরি কি ভক্তি বিনু, ধৃক্ জীওয়ন সংসার।
ধূয়াকা ধৌর্ হর যো্যা, যাত ন লাগে বার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এক হরিনাম ছাড়া এই সংসারেতে বেঁচে থাকা বৃথা। গেলেই হয় যেমন লাঙ্গলের ফাল মাটিতে যেতে দেরি হয় না।

'কবীর জগৎ মাহ মন র্াচিয়া, ঝু্টে ফুল কি লাজ।
তন্ বিন্শে কুল বিন্শে, রটে ন রাম জাহাজ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জগতের মধ্যে লাগিয়ে রেখেছে মনকে। মিথ্যে কুলের লজ্জা। শরীর বিনাশ হলো, কুলও বিনাশ হবে। তখন রামনামের যে জাহাজ যার দ্বারায় ভবসমুদ্র অতিক্রম করা যায় তা আর রটে না অর্থাৎ তা আর হলো না।

'কবীর এহ তন্ কাঁচা কুম্ভ হয়, চোট লাগে ফুটি যায়।
এঁকৈ হরিকে নাম বিনু, যব তব্ জীউ জহড়ায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই শরীর কাঁচা মাটির কলসীর মতো। আঘাত লাগলেই ভেঙ্গে যাবে। এক হরিনাম ছাড়া জীব যখন তখন মরে যাবে অর্থাৎ হঠাৎ একদিন মরে যাবে।

'কবীর এহ তন্ কাঁচা কুম্ভ হায়, লিয়ে কি রস্থ হায় সাথ।
ঠব্কা লাগা ফুটি গয়া, কছু নহি আয়া হাথ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই শরীর কাঁচা মাটির কলসীর মতো। তাই সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছো কিন্তু তা অল্প আঘাতেই ভেঙ্গে যেতে পারে। তখন হাতে কিছুই আসবে না।

'কবীর এহ তন্ কাঁচা কুম্ভ হায়, মূঢ় করে বিশ্‌ওয়াস।
কহে কবীর বিচারিকে, নহি পলক্ কি আশ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই শরীর কাঁচা মাটির কলসীর মতো। এমন শরীরকে মূঢ় ব্যক্তিরাই বিশ্বাস করে। তারা মনে করে এই শরীর আর যাবে না, চিরকাল থাকবে। কিন্তু কবীর সাহেব বিচার করে বলছেন, এই শরীরের আশা এক পলও নেই অর্থাৎ এক পলের মধ্যে দেহ যেতে পারে।

'কবীর পানি মাইঁকা বুদ্‌বুদা, দেখৎ গয়া বিলায়।
য়্যাছাহি জীয়ারা যায়েগা, দিন দশ্ ঠোগরি লগায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যেমন জলের মধ্যে বুদ্‌বুদ্ দেখতে দেখতে লয় হয়ে যায় তেমনি এই জীবন চলে যাবে। দশ দিনের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছো মাত্র।

'কবীর এহ তন্ যাৎ হায়, শকে তো ঠোর লাগায়ো।
রাজা রাণা সভ্ গয়া, কাহু ন রহিয়া ঠারো।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই শরীর চলে যাচ্ছে। যদি পারতো এক জায়গায় কিনারা করে লাগিয়ে রাখো। রাজা, রাণা প্রভৃতি সকলেই গেছেন। কেউই স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না।

'কবীর এহ তন্ যাৎ হায়, শকেতো লেহু বহোরি।
নংগী হাথেতে গয়ে, যাকে লাখ করোর।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই শরীর তো চলে যাচ্ছে। যদি পারো তো ফিরিয়ে আনো। কারণ উলঙ্গ অবস্থায় শুধু হাতে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী চলে গেছে।

'কবীর বাসর সুখ নহি বয়েন সুখ, না সুখ স্বপ্নে মাহ।
যো নর বিছুরে রাম সোঁ, তিন্‌হ কো ধূপ ন ছাঁহ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, যে সব মানুষ ভুলে আছে রামচন্দ্রকে, তাদের দিনেও সুখ নেই, রাতেও সুখ নেই। স্বপ্নেও সুখ নেই। তাদের রোদ্দুর নেই, ছায়াও নেই।

'কবীর দিন গঁওয়ায়া মুপৎ মে, ছুনিয়া ন লাগি সাথ।
পাও কুল্‌হাড়ি মারিয়া, গাফীল অপনে হাথ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দিনটা কাটালে বৃথা কাজে। এ জগৎ তোমার সঙ্গে যাবে না। বৃথা অমনোযোগী হয়ে নিজের পায়ে মারলে নিজে কুড়াল।

'কবীর এহ তন বন ভয়া, কর্ম্ম যো ভয়া কুল্‌হার।
অপনে অপু কো কাটিয়া, কহেঁ কবীর বিচার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই দেহটা হয়েছে জঙ্গলে পূর্ণ। আর কর্ম হচ্ছে কুঠার। এখন আপনাতে যেসব জঙ্গলরূপ কর্ম আছে তা ঐ কুঠারের দ্বারা কেটে ফেলো। এইটিই কবীর সাহেব বলছেন বিচার করে।

'কবীর কুল খোয়ে কুল উব্‌রে, কুল রাখে ফুল যায়।
রাম অকুল কুল মেটিয়া, সভ্‌ কুল গয়া বিলায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কুল নষ্ট করলে আবার কুল হয়। কুল রাখলে কুল যায়। যখন রামচন্দ্র কুল অকুল মিটিয়ে দেবেন তখন সব কুল লয় হয়ে যাবে।

'কবীর ছুনিয়াকে ধোঁকে মুয়া, চলা যো কুল কি কাঁণ।
তব্‌কা কো কুল লাজ্‌সি, যয় লয় ধরে মশান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, জগতের ধোঁকায় সকলেই প্রায় মরলো। কেবল কুল ও কানে শুনে চলেছে অর্থাৎ কানে শুনেই সমস্ত মিথ্যে কাজ করছে। কিন্তু যখন মশানে নিয়ে যাবে তখন তোমার কুলের লজ্জা থাকবে কোথায়!

'কবীর কুল করণীকে কারণে, হংসা চলে বিগোয়।
তব কা কো কুল লাজসি, যব চারি চরণ্‌কা হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কুলকর্ম করবার কারণ কী তোমার জন্ম। যখন তুমি হংসে চড়ে চললে চার জনের কাঁধে চড়ে তখন কারই বা কুল আর কাকেই বা লজ্জা।

'কবীর কুল করণীকে কারণে হোয়ে রহা নল সূ্ঁম।
তব কাকো কুল লাজসি, যব যম ধুমাধুম।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কুলকর্ম বজায় রাখার জন্যে কৃপণ হয়ে রয়েছো। কিন্তু যখন যম এসে মহা ধুমধামের সঙ্গে নিয়ে যাবে তখন কারই বা কুল আর কাকেই বা লজ্জা। সব থাকবে পড়ে।

'কবীর কুল করনী কি পাগ্‌রী, কূপ কঠোর তা মাহি।
বাঁচি চলা সো উব্‌রা, নহি তো বুড়া তাহি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কুলকর্মস্বরূপ কলসী অর্থাৎ কর্মরূপ কলসী-স্বরূপ আত্মা। তা রয়েছে কূপের (সংসার) মধ্যে। যদি তা হতে ওঠে তবে তা বেঁচে যায়। নতুবা ডুবে যায়।

'কবীর যেতা ডর হায় জাৎকি, তেতা হরি কি হোয়।
ঢোল দামামা দেই চলে, চলা ন পকরে কোয়।'

অর্থাৎ কবীর বলছেন, যতো ভয় করো জাতের জন্যে ততো ভয় কী করো ভগবান হরির জন্যে। হরির জন্যে ততো ভয় করলে লোকে ঢোল দামামা বাজিয়ে তোমার সঙ্গে যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমাকে কেউই ধরতে পারবে না।

'কবীর কেওয়ল রামকো, তু মতি ছোড়ে ওট্।
নাতো অহরুল খন বিখে, খনি সহেগা চোট।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, কেবলনামক কর্মই হচ্ছেন রামচন্দ্র অর্থাৎ ক্রিয়াই হচ্ছে সব। তুমি তাঁর আশ্রয় ছেড়ো না। এই কর্ম ছেড়ে অন্য বিষয়ে মন দিলে বারংবার জন্ম-মৃত্যুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

'কবীর কেওয়ল রাম কহু, সুজগরি বা ঝারি।
কুল বড়াই বুড়সী, ভারী পরসী মারি।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এই সুন্দর জগতে এসে কেবলরূপী রামচন্দ্রের কর্ম করো। তাহলে তোমার কুল ও অহঙ্কার সমস্ত ডুবে যাবে ও আর একটি ভারী প্রতিবেশীকে মারবে।

'কবীর কায়া মঞ্জন ক্যা করে, কপড়া ধোয়ন খোয়।
উজল ভয়ে ন ছুটসি, যে'। মন মইল ন খোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, দেহ পরিষ্কার করেও কাপড় ধুইয়ে কী করছো। দেহ পরিষ্কার করলে মনের ময়লা যাবে না। মনের ময়লা না গেলে প্রকৃত অবস্থা পাবে না।

'কবীর উজল পেখে কাপড়া, পান সুপারি খায়।
এক হরিকে নাম বিনু, বাঁধা যমপুর যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, এক হরিনাম ছাড়া পরিষ্কার কাপড় পরে ও পান-সুপারি খেয়ে বাবু সেজে বেড়াচ্ছে। অথচ একদিন বন্ধ- অবস্থায় যেতে হবে যমপুরে। আত্মীয়-স্বজন কেউই রাখতে পারে না।

'কবীর ডর পোঁটেড়ি পাগ্ সোঁ, মত্তি ময়লি হোয় যায়।
পাগ্ বেচারি ক্যা করে, যৌ শির নহি মাটি খায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পাগ্ড়ী পাছে বাঁকা হয় এই ভয়ে সর্বদা কষার জন্যে ময়লা হয়ে পড়ে মতি। তাতে পাগ্ড়ীর দোষ কী, যদি মাথা মাটি না খায়। তাহলে আর বাঁকাসোজা থাকবে না। তখন ঠিক হবে।

'কবীর মন্দিল্ মাহি পৌড়তে, পরিমল অঙ্গ্ লগায়।
ছত্রপতিকে রাখমে, গদ্হা লোটে যায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মন্দিরের মধ্যে পড়ে থাকায় শরীর হচ্ছে নির্মল। আর যিনি ছত্রপতি তাঁর কাছে গাধাও লুটিয়ে যায়।

'কবীর গৌখন্ মাহি পৌড়তে, পরিমল অঙ্গ্ লগায়।
স্বপ্না সম দেখৎ রহে, গয়া সো বহুরি বিলায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, গৌখন গো অর্থাৎ জিবের দ্বারায় গুরুজ

কোনো কাজ করতে করতে অঙ্গ নির্মল হওয়ায় স্বপ্নের মতন নানারকম দেখছিলুম। কিন্তু যা দেখছিলুম তা আর ফিরলো না অর্থাৎ যেরূপ চলে গেলো তা আর ফিরলো না।

'কবীর খাসামল্ পহিঁরৈ, খাতে নাগর পান।
তেভী হোতে মানবী, কর্‌তে বহুৎ গুমান।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, পরিষ্কার মল্‌মল্ পরে, পান খেয়ে বাবু সেজে অহংকারে মত্ত হয়ে কেবল পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করেন। অথচ নিজের দোষ দেখে না। মনে মনে গুমর করে, আমরা মানুষ।

'কবীর জঙ্গল্ ঢেরি রাখ কি, উপর ঘাস পতঙ্গ্।
তেভি হোতে মানবী, কর্‌তে রঙ্গ্ বেরঙ্গ্।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, ছাইভস্মের ঢিবির ওপর জঙ্গল হয়ে তাতে অনেক ঘাসপতঙ্গ রয়েছে। তারাও আবার মানুষ হয়েছি বলে কতো রঙ-তামাশা করছে।

'কবীর মেরা সঙ্গী কোই নহি, সভে সারথী লোয়।
মন পরতীৎ ন উপ্‌জে, জীউ বিশ্রাম ন হোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, আমার সঙ্গী কেউই নেই। যারা আছে তারাও আবার সকলেই সারথী হতে চায়। মনের বিশ্বাস না হওয়ায় জীবের বিশ্রাম হচ্ছে না।

'কবীর থল্ চরন্তা মির্গলা, এক যো বেধা সোহ।
হম্ তো পাথী বসি রাহা, ফেরি করেগা কৌন্‌হ।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, মৃগ চরে বেড়াচ্ছে। তাকে যে মেরেছে সেও আমি। আর আমি পথিক বসে আছি। সুতরাং ফেরি আর কী করবে!

'কবীর ইৎ ঘর উৎ ঘরওনা, বণিজন্ আয়ে হাট।
কর্ম্ম কিরানা বেচিকে, চলিয়ে অপনি বাট।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, নিজের ঘর ত্যাগ করে এই পরের ঘরে

এসেছি। যেমন বণিকেরা হাটে গিয়ে নিজের কাজ বেচা-কেনা করে আবার নিজের রাস্তায় যায় তেমনি।

'কবীর মারগ্ উপর দৌড়না, সুখ নিদরি না শোয়।
পরা পরায়ে দেশরা, ওছি ঠোর ন খোয়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রাস্তায় দৌড়ে চলতে হলে সুখে নিদ্রা যেয়ো না। কারণ সে দেশ সকল দেশের পর। অতএব বৃথা নিদ্রা গিয়ে তা খুইয়ো না অর্থাৎ সময় নষ্ট করো না।

'কবীর নাও যো ঝঝরি, কুরসো খেওয়ান হার।
হলুকে হলুকে তরি গয়ে, বুড়ে যিন্হ শির ভার।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, নৌকো যা আছে তাও আবার ঝাঁঝরার মতো ছিদ্রযুক্ত। নৌকোর দাঁড়ও ঠিক বইছে না। যেগুলি হাল্কা হাল্কা ছিলো সেগুলি গেলো তরে। আর যাঁর মাথায় ভার ছিলো তিনিই গেলেন ডুবে।

'কবীর রাম কহন্তে খিঝি মরে, কুশ্রী হোয় গলি যায়।
শূকর হোয়েকে আও তরে, নাক বুড়ন্তে খায়।'

অর্থাৎ, কবীর বলছেন, রামনাম করতে হলেই জ্বলেপুড়ে মরে। আর সে কুশ্রী হয়ে গলে যায়। শূকর অবতার হয়ে নাক বুড়িয়ে খাচ্ছে অর্থাৎ শূকর যেমন খায় নাক ডুবিয়ে তারাও তেমনি মদ, মাংস, বেশ্যা আর পরের সর্বনাশ করে নাক ডুবিয়ে খায়।

এমনিভাবে ভক্ত কবীর—জ্ঞানী কবীর—পরম ভাগবত কবীরের শ্রীকণ্ঠ হতে বহু সুললিত দোঁহা উচ্চারিত হয়েছে। সেগুলির সংখ্যা হবে অনেক। সেগুলি মনে-প্রাণে অনুধ্যান করলে মন ও অন্তর ঐশ্বরিক ভাবে পূর্ণ হয়ে দিব্যানন্দ অনুভূত হয় এবং তরঙ্গসঙ্কুল সংসারসমুদ্রে বিরাজ করে অপার শান্তি ও শ্রী।